বিশেষ ঘনাদা সংখ্যা

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

জুন ১৯৮৬

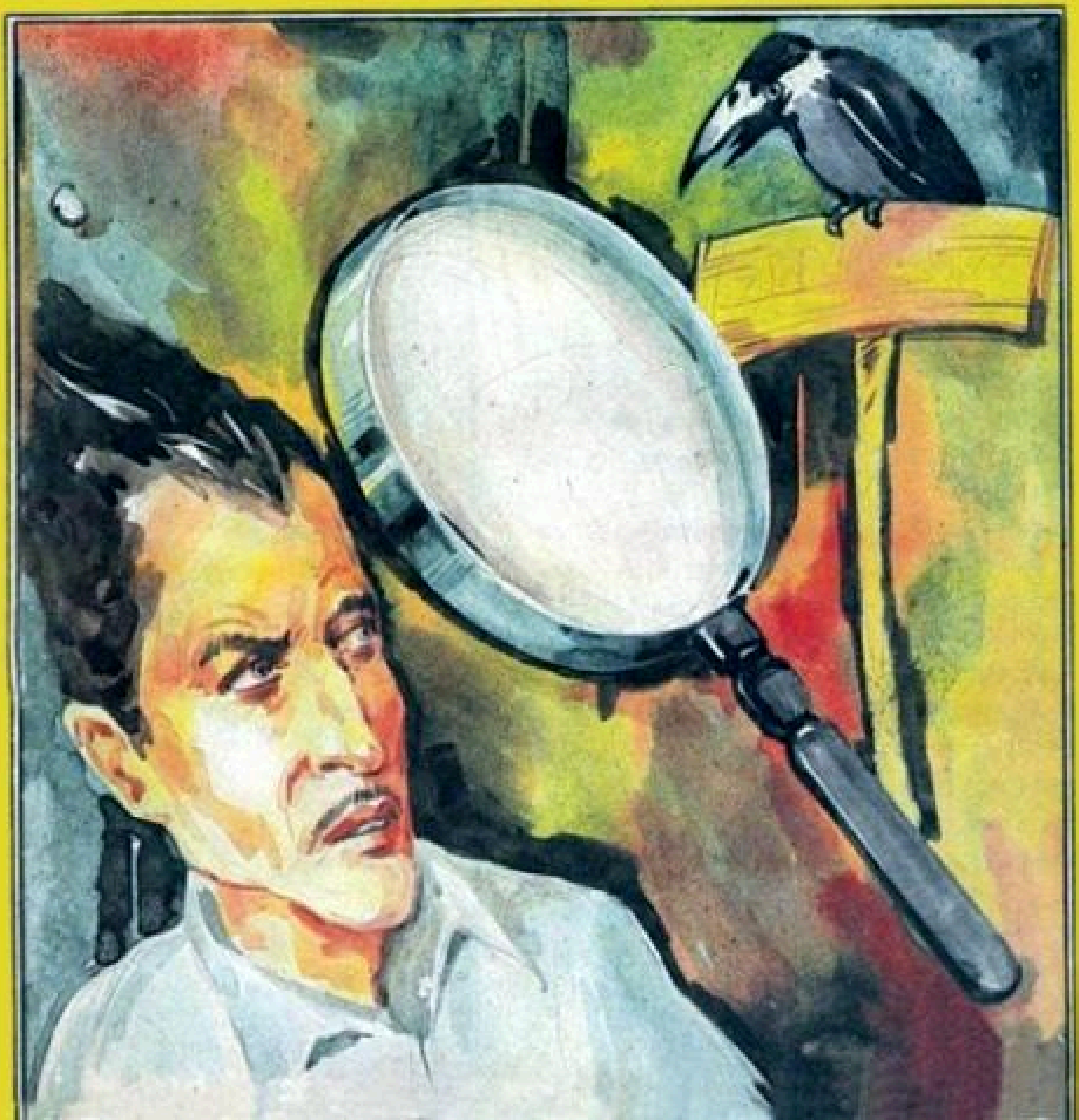

ষষ্ঠ বর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা জুন '1986

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

সূচীপত্র

চিঠিপত্র 4 **:** **দপ্তর থেকে :** ঘনাদা ক্লাব ॥ সমরজিৎ কর 7

ঘনাদা বিষয়ক গল্প, ছড়া ও আলোচনা : ঘনাদার ভোজন বিলাস । লীলা মজুমদার 19 : বিজ্ঞানী ঘনাদা ॥ ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য 39 : ঘনাদার বিশ্ব পরিক্রমা ॥ সিদ্ধার্থ ঘোষ 29 : বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেন ॥ অতসি সেন 27 : ঘনাদা ও মহাভারত ॥ কিন্নর রায় 47 : ঘনাদা ও বিশ্বের নেতৃবর্গ ॥ জয়ন্ত দত্ত 49 : অথ ঘনাদা জন্মকথা ॥ পূর্ণেন্দু কিশোর ব্যানার্জি 22 : ঘনাদায়ন ॥ অনিল কর্মকার 21 : ঘনাদার দেখা পাওয়া ॥ অরিজিৎ দত্ত 30

বিশেষ রচনা : ঘনশ্যাম চরিতকথা ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র 15

সাক্ষাৎকার : ঘনাদা এলো কোথা থেকে 10

ঘনাদার প্রথম গল্প : মশা ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র **:** টীকা ও ব্যাখ্যা ॥ ধরণী ঘোষ 31

ছবিতে গল্প : তেল ॥ কাহিনী **:** প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ চিত্ররূপ : গৌতম কর্মকার 23

বিভিন্ন শিল্পীর চোখে : অজিত গুপ্ত 10, 16 : অহিভূষণ মালিক 21 : নারায়ণ দেবনাথ 42 : ধীরেন বল 50 : ধ্রুব রায় 61 : প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় 34

পড়াশোনা : অভিস্রবণ ॥ দিনোজকুমার দে 59 : পদার্থ বিজ্ঞানের কথা । অজয় চক্রবর্তী 60 :

রঙ্গীন ফিচার : খরগোস ॥ ঋতিংকর দত্ত ॥ কলম্বাসের বাহামা আবিষ্কার ॥ কিন্নর রায় 12 : সিনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট 14 : সিনিয়র ফোটো ক্যুইজ 14 : পাদপাদপ ॥ এণাক্ষী বিশ্বাস 55 : কোয়ার্জ ॥ অমরনাথ রায় 56 : ঘড়ি আবিষ্কার ॥ অলয় ঘোষাল ও ঋতুপর্ণ ঘোষ 57 : জুনিয়ার ক্যুইজ কনটেস্ট 58 : জুনিয়র ফোটো ক্যুইজ 58

ধারাবাহিক উপন্যাস : অমলথীয়ার রহস্য ॥ নিরঞ্জন সিংহ 51

জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য রচনা : পরিবেশ দিবসের ভাবনা ॥ রবীন বসু 5 : বিজ্ঞান সংবাদ 17

ছোটদের দপ্তর : উত্তরদাতাদের নাম ॥ 63 : নিজে নিজে কর ॥ বাসুদেব সরকার 66 আইকিউ টেস্ট 63 : শব্দকুটের সমাধান 63 : ঘনাদাকুট ॥ আশিস মান্না 64

প্রচ্ছদ : অলয় ঘোষাল : অন্যান্য ছবি ॥ রেবতীভূষণ, গৌতম কর্মকার ও অলয় ঘোষাল

প্রধান সম্পাদক সমরজিৎ কর

সম্পাদক রবীন বল। সহসম্পাদক জয়ন্ত দত্ত

খ্রিস্টপূর্ব যুগেও দূরবীনের ব্যবহার ছিল

মার্চ সংখ্যায় (1986) 'ভারতীয় জ্যোতিঃপদার্থ বিজ্ঞান' নিবন্ধে শ্রীবিমান বসু লিখেছেন, 'ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় দূরবীনের ব্যবহার শুরু হয় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে।'

কিন্তু 'দূরবীন' (বাংলায় দূরবিন হওয়াই উচিৎ) শব্দটি ফার্সি। 'দূরবীক্ষণ' একটি অর্বাচীন শব্দ নির্মাণ। যেমন আটলাণ্টিককে করা হয়েছে 'আতলান্তিক'। দূরবিন যন্ত্রটি যে মুসলিম আমলে ভারতে এসেছিল, তার প্রমাণ শব্দটি ফার্সি। (দেখুন, সুনীতিকুমারের O.D.B.L. কিংবা এ উলাস্টনের Perso-English Dictionary) একথা ঠিক, 1609 সালে আধুনিক উন্নত দূরবিন যন্ত্রের প্রথম আবির্ভাব কিন্তু সামরিক উদ্দেশ্য এবং বিভিন্ন কাজে এ যন্ত্রের ব্যবহার ছিল খ্রিস্টপূর্ব যুগ থেকেই। তাছাড়া পারস্য অঞ্চলে প্রাচীন জ্যোতির্বিদরা এ যন্ত্র ব্যবহার করতেন। কাজেই উল্লিখিত উদ্ধৃতিটি ভুল। মুসলিম আমলে ভারতে সামরিক অসামরিক উভয় কাজেই দূরবিনের ব্যবহার ছিল। হিন্দু জ্যোতির্বিদরাও করে থাকবেন বৈকি।

যেমন ধরুন, 'কাগজ'। এ শব্দটিও ফার্সি এবং এ জিনিসের কোনো প্রাচীন ভারতীয় নাম নেই। কাজেই বোঝা যায়, কাগজও মুসলিম আমলেই ভারতে এসেছিল প্রথম। (এ জিনিসটির ইংরেজি নাম পেপার। তার উৎস গ্রিক প্যাপিরাস)।

এবার শ্রীসমরজিৎ করের 'আবিসেনা' সম্পর্কে কিছু বলি। এই বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের প্রকৃত নাম 'আবু আলি আল-হুসাইন ইবনু আবদাল্লাহ্ ইবনু সিনা'। ইউরোপে ইনি পরিচিত ছিলেন 'Avicenna' নামে। মুসলিমবিশ্বে তাঁকে সবাই জানে 'আবু সিন্না নামে। পুরো নামটাই আরবি শব্দের। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আরবি-হিব্রু আমাদের বাংলা-ওড়িয়া কিংবা বাংলা-অসমিয়া অথবা বাংলা-হিন্দির মতো সম্পর্কযুক্ত। আরবি, হিব্রু এবং আরামাইক এই তিনটি বড় ভাষার উদ্ভব ঘটেছে একই উৎস থেকে—যাকে সেমিটিক বলা হয়।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, 37/1 গোরাচাঁদ রোড, কলকাতা-14।

আমরা জানি জ্যামিতি শাস্ত্র পৃথিবীর পরিমাপ বিষয়ক নীতি ও তত্ত্ব প্রকাশ করে। বৈজ্ঞানিক সত্য হল পৃথিবী গোলাকার। তাহলে গোলাকার পৃষ্ঠতল বিশিষ্ট কোন বস্তুর উপর সরলরেখা টানা বা কোন সামতলিক ক্ষেত্র আঁকা সম্ভব হবে কি করে? যে কোন রেখা তা সে যত ক্ষুদ্রই হোক তা তো পৃথিবীর পরিধির অংশ বিশেষই হবে। তা হলে সরলরেখা বা সামতলিক ক্ষেত্রের ধারণাটা কি পুরোপুরি অবাস্তব আর এই অবাস্তব ধারণার উপরই এতো বড় শাস্ত্র গড়ে উঠেছে?

প্রশ্নটির যথাযথ উত্তর পত্রিকার পরবর্তী যে কোন সংখ্যায় কেউ বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করলে উপকৃত হব।

তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য, ফতেসিংপুর, মেদিনীপুর।

অঙ্কের নম্বর বাড়াতে

এই পত্রিকার 'মার্চ' সংখ্যায় মাননীয় কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অংকে নম্বর বাড়াতে হলে' খুবই সময়োপযোগী। তবে আলোচনা বিস্তৃত হলে বা পরিসর আর একটু বাড়ালে আরও ভালো হোত।

এবার তাঁর লেখা সমাধানের একটা পদ্ধতি সম্পর্কে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। কানাইবাবু লিখছেন: $(x-a-b)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)=0$ সমীকরণের সমাধানের ক্ষেত্রে $\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)$ রাশিটি x বর্জিত বলে এর মান শূন্য হতে পারে না—এভাবে লেখা ভুল। এর পরে তিনি কি লিখলে ঠিক হবে তার নমুনা দিয়েছেন। আমার মনে হয় ঐ যুক্তি অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীদের বুঝতে অসুবিধা হবে। যদি এর পরের লাইনে কেবল $x-a-b=0$ লিখে বা $x-a-b=\frac{0}{\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)}$ $=0$ এভাবে লিখে x-এর নির্ণয় করা যায় তাহলে কি ঠিক হবে না। বা $\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)$ ধ্রুবক বলে শূন্য হতে পারে না—এটা কি চলবে না? আর যদি 'ধ্রুবক' যুক্তি মেনে নেওয়া যায় তবে $\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)$ রাশিটি x বর্জিত বলে এর মান শূন্য নয় লিখতেই বা অসুবিধা কোথায়? —কারণ একটি অজ্ঞাত রাশি-বিশিষ্ট সমীকরণে x-চলকহীন স্বভাবতই x-বর্জিত রাশি ধ্রুবক হবে।

আমার দেওয়া যুক্তিগুলোর ত্রুটিগুলো সত্বর জানাতে অনুরোধ করছি।

কানাইবাবার অভিমত জানতে চাই।

রাধাশ্যাম মাইতি,
দেপাল, মেদিনীপুর।

পরিবেশ দিবসের ভাবনা

রবীন বসু

কিছুকাল আগেও চৈত্র বৈশাখ মাসে সারাদিন কাটফাটা রোদ্দুরের পর দেখা যেত সারা আকাশ হঠাৎ-ই কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। শোনা যেত মেঘের গুরু গুরু গর্জন আর দেখা যেত বিদ্যুতের ঝিলিক। কালো আকাশের বুক চিরে উড়ে যেত সাদা বকের দল। কিন্তু আজকাল আর এসব দৃশ্য দেখতে পাই কই? দেখতে পাইই না বা কেন? প্রকৃতির এই নিয়মের রাজ্যে ব্যতিক্রম ঘটছে কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন বিজ্ঞানীরা।

তাঁদের ধারণা বাতাসে অতিরিক্ত পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড জমা হচ্ছে। কারণ কলকারখানায় পুড়ছে কয়লা ও অন্যান্য জ্বালানি। উনুনে জ্বলছে কয়লা, রাস্তায় চলছে গাড়ি। এই জ্বালানির পরিমাণও ফি বছর বেড়ে চলেছে। মানুষ জন তো বাড়ছে প্রত্যেক বছর। 1900 সালে যেখানে লোক সংখ্যা ছিল 150 কোটির মতো আজ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 350 কোটিতে। তাই জ্বালানির পরিমাণ তো বাড়া স্বাভাবিক। জ্বালানির পরিমাণ বাড়ার ফলে বাতাসে জমা হচ্ছে প্রচুর পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস। এবং এই কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস জমার ফলে গত 100 বছরে তাপমাত্রা বেড়েছে প্রায় 4 ডিগ্রী সেলসিয়াসের মতো। বাতাসের তাপমাত্রা পরিবর্তনের ফলে আবহাওয়া বদলাবে। এবং এরই ফলে অনিবার্য ভাবে পৃথিবীর ঋতুচক্রে ঘটবে পরিবর্তন। ফলে মরুভূমি অঞ্চলে হয়ত শুরু হবে প্রবল বর্ষণ। এবং বর্ষণশীল অঞ্চলে দেখা দেবে অনাবৃষ্টি। ফলে ক্ষতি সব চাষবাসের।

শুধু কি তাই? কত রকম ভাবেই না প্রকৃতির ক্ষতি সাধন হচ্ছে। বন জঙ্গল কেটে মানুষ সংগ্রহ করছে কাঠ। বন জঙ্গল কমে যাওয়ায় প্রকৃতি হারিয়ে ফেলছে ভারসাম্য। ফসল উৎপাদনের জন্য মানুষ ব্যবহার করছে নানা রকম সার ও কীটনাশক দ্রব্য। যার অনেকটাই ধোয়ানির সঙ্গে গিয়ে পড়ছে নদী নালা পুকুরে। এতে করে মাছের পরিমাণ যাচ্ছে কমে। এই পরিবেশ দূষণ নিয়ে আজ শুধু বিজ্ঞানীরাই নয়, সাধারণ মানুষও চিন্তিত।

সামনে 5ই জুন, বিশ্ব পরিবেশ দিবস। পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশকে দূষণ থেকে মুক্ত করার জন্য শুধু প্রতিজ্ঞাই নয় যে কোন একটা কর্মসূচীও আমাদের নেওয়া দরকার। আর কিছু না হলেও একটা গাছও তো আমরা বাড়ির পাশে লাগাতে পারি।

বাঁচার জন্য

খাদ্য

খাদ্যের জন্য

কৃষি

কৃষির জন্য

বর্ষা

বর্ষার জন্য

মেঘ

মেঘের জন্য

গাছ

একটি গাছ লাগান

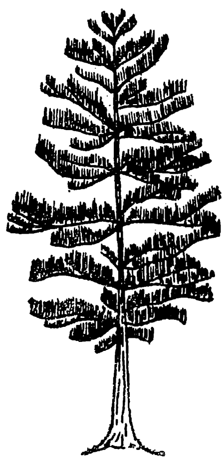

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ

কর্তৃক প্রচারিত

মোটর গাড়ীর ধোঁয়া বন্ধ করুন

সহরাঞ্চলে বায়ুদূষণের একটি প্রধান উৎস মোটর গাড়ী নিঃসৃত ধোঁয়া।

ধোঁয়া বেরুনোর অর্থ—

—পেট্রোলের পূর্ণজ্বালান না হওয়া
—কাঁচা তেলের অপচয়
—বেশী তেল পুড়িয়ে কম রাস্তা যাওয়া।

এর প্রতিবিধান কি?

—ইঞ্জিন টিউনিং করে, পরিষ্কার করে, গ্যাজেট লাগিয়ে, ধোঁয়া বেরুনো বন্ধ করুন।
— কম তেল পুড়িয়ে বেশী রাস্তা চলুন।

এতে দূষণ বন্ধ হবে, মানুষ বাঁচবে—গাড়ীর মালিকের সাশ্রয় হবে।

পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ

★ ★ ★ ★ ★

প্রচলিত "সেপটিক ট্যাংক" পায়খানা	"পোর ফ্লাশ" (দুটি পাতকুয়াযুক্ত) পায়খানা
১। নির্মাণে ব্যয় বেশী	১। নির্মাণ ব্যয় কম।
২। কয়েক বৎসর অন্তর পরিষ্কার করিতে প্রচুর খরচ।	২। পরিষ্কারের জন্য খরচের কোন প্রয়োজন নাই। অপর পক্ষে মৃত্তিকায় পরিণত মল সার হিসাবে বিক্রয় করা যায়।
৩। নির্গত জল "সোকপিট" না থাকিলে এবং ড্রেনে নিক্ষেপ করিলে জলদূষণ সৃষ্টি করে।	৩। জলদূষণ করার কোন সম্ভাবনা নাই।
৪। চৌবাচ্চার মধ্যে বিপুল সংখ্যায় মশক জন্মায়।	৪। মশক জন্মিবার কোন সম্ভাবনা নাই।

"সেপটিক ট্যাংক" পায়খানা নয়—"পোর ফ্লাশ" (দুই পাতকুয়া যুক্ত) পায়খানা নির্মাণ করুন, জলদূষণ বন্ধ করুন।

পরিবেশ দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঃ বঃ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ

ঘনাদা ক্লাব

সমরজিৎ কর

এ লেখার শিরোনাম দেখে তোমরা হয়ত চমকে উঠবে। বলবে 'দপ্তর থেকে' বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়েই তো বলা হয়। হঠাৎ ঘনাদা কেন? কে এই ঘনাদা?

ঘনাদা যে কে, আমার ধারণা অনেকেই তা জান। সেটা যে তেমন বেশি কিছু জানা তাও নয়। তাঁর বয়েস পঁয়ত্রিশও হতে পারে পঞ্চাশও হতে পারে—দেখে বোঝার জো নেই। আসল নাম ঘনশ্যাম দাস। সাহেবরা ডাকেন 'ডস' বলে। আর আমরা যারা বাঙালি তাদের কাছে 'ঘনাদা'ই যথেষ্ট। কলকাতা কর্পোরেশনের আঁকা-বাঁকা গলি বনমালী নস্কর লেন। এই গলির একটি জীর্ণবাড়ির ছোট্ট একটি চিলেকোঠার ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে হঠাৎ একদিন ধূমকেতুর মত এসে তিনি আস্তানা গাড়েন। মেস বাড়ি। শিবু, গৌর এমনি নামের কয়েকটি যুবক সেখানে বসবাস করে। ঘনাদার দারুণ ব্যক্তিত্ব, কথার প্যাঁচ। সেই কথার প্যাঁচে তারা সবাই পরাজিত। তাদের উপর দিয়েই চলে ঘনাদার খরচ। তারা যে বিরক্ত হয় না সে কথা বলব না। তবু অদ্ভুত একটা ভয় এবং শ্রদ্ধাও ছিল সেই সঙ্গে। আসলে অদ্ভুত সেই মানুষটি সম্পর্কে কৌতূহলই কেমন যেন তাদের মেষ শাবকের মত করে দেয়। ঘনাদার জীবনের এক একটি ঘটনা শোনার ব্যাকুলতা নিয়ে প্রতিমুহূর্তে অপেক্ষা করে তারা।

আর সে ঘটনাও কি কম? কি জানেন না ঘনাদা? পৃথিবীর হেন জায়গা নেই যা তাঁর ঘোরা নয়। ডাকাতে মানুষ থেকে শুরু করে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী—সবাই তাঁর পরিচিত। মৃত্যুর মুখ থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছেন কতবার, একটি 'মশা' অথবা পাথরের টুকরোর জন্যে সে কি কাণ্ড। এ সব গল্প শুনতে শুনতে শিউরে ওঠে তাঁর শ্রোতারা।

তা হলে আসল কথাটাই বলি। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার এবং কবি শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্রের সৃষ্টি এই ঘনাদা। ঘনাদার মুখ দিয়ে তিনি অনেক গল্প শুনিয়েছেন আমাদের। গল্পের চরিত্রগুলি কাল্পনিক, কিন্তু প্রতিটি গল্পের বিষয়বস্তুর মধ্যে তিনি তুলে ধরেছেন বিজ্ঞানের নানা রকম তথ্য, অনেক অজানা ঘটনা। গল্পের মধ্যে যেমন রয়েছে কড়া অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ, তেমনি বিজ্ঞান নির্ভর কথাবার্তা। আমরা তখন তোমাদের মতই কিশোর। গল্পগুলি সে সময়ে যখন প্রকাশ হতে থাকে সেগুলি পড়ে কি রোমাঞ্চই না পেয়েছিলাম। গল্পের ভেতর দিয়ে কঠিন বৈজ্ঞানিক বিষয় যে এত সহজ করে বলা যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্রের আগে বাংলা ভাষায় আর কখনো ঘটে নি। ঘনাদার অ্যাডভেঞ্চার শুনতে শুনতে বিজ্ঞানের কত অজানা কথাই না আমরা মনের অজান্তে শিখে ফেলেছিলাম তখন।

এখন প্রশ্ন হল ঘনাদা ক্লাব তৈরি হল কিভাবে? প্রায় বছর দু'এক আগে কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাতায় তোমাদের প্রিয় লেখক সিদ্ধার্থ ঘোষ চিঠি লিখেছিলেন। তার চিঠির মূল বক্তব্য ছিল প্রেমেন্দ্র মিত্রের সৃষ্টি এই সর্বজনপ্রিয় ঘনাদাকে নিয়ে একটি ক্লাব গঠন করা। উদ্দেশ্য ঘনাদা চর্চা। যেভাবে ইংলণ্ড আমেরিকায় তৈরি হয়েছে শার্লক হোমস ক্লাব। সঙ্গে সঙ্গে এল আরো চিঠি সিদ্ধার্থ ঘোষকে সমর্থন করে। নতুন ভাবনাও সংযোজিত হল। অনেক পাঠক দাবি জানালেন শুধু বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প পাঠের আয়োজন করলেই চলবে না। চাই পুরোপুরি একটি সংস্থা--যা বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প পাঠের আয়োজনও করবে, আবার বিজ্ঞান বিষয়ক যাবতীয় কর্মসূচীও গ্রহণ করবে। বহুদিন ধরে অধিকাংশ পাঠকের সমর্থনে তৈরি হল কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ। সিদ্ধান্ত হল এই কিশোর বিজ্ঞান পরিষদের দুটি শাখা হবে—এক ঃ সায়েন্স ক্লাব বিভাগ, দুই ঃ ঘনাদা ক্লাব। এই ক্লাবেরই প্রথম বৈঠক হয়েছিল স্বয়ং প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়িতে। ক্লাবের উদ্দেশ্য, কিশোর কিশোরীদের মধ্যে ঘনাদার অনুকরণে গল্পের মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচার। সে গল্প বড়রাও বলতে পারেন। তোমরাও বলতে পার। এতে করে অজ্ঞাতসারে বিজ্ঞানের অনেক ঘটনা যেমন তোমরা জানতে পারবে, ঠিক তেমনি কিভাবে মন টানার মত গল্প বলতে হয় তাও শিখতে পারবে। কল্পনা করার ক্ষমতাও বাড়বে সঙ্গে সঙ্গে।

শিল্পী রেবতীভূষণ অঙ্কিত

এ সব কথা ভেবেই 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান'-এর এবার-

কার এই বিশেষ সংখ্যাটি আমরা প্রকাশ করলাম। এই সংখ্যায় ঘনাদা সম্পর্কে অনেক লেখাও থাকছে।

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদের প্রথম বৈঠক শেষে প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছেন লীলা মজুমদার

আমরাও চাই তোমরাও বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প লেখ। ঘনাদার অনুকরণেও গল্প বলতে পার। অথবা কল্প-কাহিনী। ইংরেজিতে যাকে বলে 'সায়েন্স ফিকশন'।

তবে হ্যাঁ, এই 'সায়েন্স ফিকশন' লেখার ব্যাপারে কয়েকটি বিষয়ের উপর তোমাদের নজর দিতে হবে। মোটামুটি তিনটি বিষয়। এক। এ ধরনের লেখায় গল্পের সুর দরকার। থাকবে নানা রকম চরিত্র। থাকবে তাদের সুখ, দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাফল্য এবং ব্যর্থতার কথা। যেমন থাকে সাধারণ গল্পে। দুই। গল্প পড়ে পাঠক-পাঠিকারা যাতে প্রতিমুহূর্তে কৌতূহল বোধ করে সে দিকটাও দেখতে হবে। তিন। সবচেয়ে যে বড় দিক সেটা হল, এ ধরনের গল্পে থাকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক। দেশে দেশে বিজ্ঞানে কত রকম গবেষণাই না চলছে। উদ্ভাবনের শেষ নেই। ভবিষ্যতে বিজ্ঞান আরো কত ভাবেই না বিকশিত হতে পারে। এসব ব্যাপার যুক্তি এবং ব্যাখ্যা দিয়ে গল্পে এমনভাবে তুলে ধরা দরকার, যাতে করে পাঠকদের কাছে তা নেহাৎ না গালগল্প হয়ে দাঁড়ায়। পাঠকরা যাতে তা অবাস্তব বলে উড়িয়ে না দেয়। গল্পে এসব কথা বলতে গেলে বিজ্ঞানে জ্ঞান থাকা দরকার।

উদাহরণ দিই। এখনকার নাম করা 'সায়েন্স ফিকশন' লেখকদের মধ্যে একজন আর্থার ক্লার্ক। একবার তাঁর সঙ্গে আমার বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কোন 'সায়েন্স ফিকশন' লেখা শুরু করবার আগে আপনি কি কোন পরিকল্পনা করে নেন?

ক্লার্ক বলেছিলেন, অবশ্যই করি। প্রথমে আমি গল্পের চরিত্রগুলি কেমন হবে, তা ঠিক করে নিই। আমার নায়ক হয়ত একজন মহাকাশ বিজ্ঞানী। মহাকাশযান নিয়ে সে ভিন্ন গ্রহে যাত্রা করবে। চলার পথে তার কাজকর্ম এবং চিন্তাভাবনায় মহাকাশের পরীক্ষালব্ধ বিবরণ যাতে প্রকাশ পায় সেটা দেখতে হয়। মহাজাগতিক রশ্মি কি, গ্রহাণুর গতিপথ, চৌম্বক বেষ্টনীর বাইরে যাওয়ার সময় যন্ত্রপাতিতে কি ধরনের গোলযোগ ঘটতে পারে, নির্জন মহাকাশযানে দিনের পর দিন কাটাতে গিয়ে আরোহীদের মনের অবস্থা কেমন হতে পারে, অথবা নতুন কিছু উদ্ভাবনা—এ সব এমন ভাবে বলতে হবে, যাতে পাঠকরা মনে করবে যা কিছু ঘটছে সবই সম্ভব। বাস্তবে তখনকার মত না ঘটলেও ভবিষ্যতে ঘটতে পারে। আজ কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে টেলিভিশন দেখান হচ্ছে, টেলিফোন করা হচ্ছে। 1946 নাগাদ এ সব সম্ভাবনার কথা একটি গল্পে বলেছিলাম আমি। তখন কৃত্রিম উপগ্রহের কথা সাধারণ মানুষ কল্পনাও করতে পারত না। কিন্তু পরে তা সত্যি হয়েছে তো?

রবীন বলের সংযোজন :

বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প বা বিজ্ঞানের কল্প কাহিনী নেহাৎ আজগুবি অবাস্তব কিছু নয়। বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পে ভবিষ্যতের নানা কল্পনার কথা থাকলেও তা কল্পনার চোখে বর্তমানকেই প্রক্ষেপ করে।

পৃথিবীর মহাকর্ষ ছিঁড়ে আজকের দিনে যে রকেট মহাকাশের বুকে পাড়ি জমিয়েছে তার লাঞ্চিং প্যাডের হদিশ কিন্তু দিয়ে গিয়েছিলেন অমর কথাশিল্পী জুলেভার্ন প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে। শুধু কি তাই, মহাকাশচারী ইউরি গাগারিনও ছোটবেলায় 'এরাউন্ড দি ওয়ার্ল্ড ইন এইট্টি ডেজ' পড়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে ভাবতেন—কবে তিনি আকাশের বুকে পাড়ি জমাবেন। তাঁর সেই স্বপ্ন সফল হয়েছিল।

এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় তথ্য আমাদের হাতেই রয়েছে। কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক পাঠক-পাঠিকাই হয়তো তা লক্ষ্য করেছ। তবুও আর একবার বলি। জানুয়ারি সংখ্যা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান 'হ্যালির ধূমকেতু সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত হয়েছিল। লিখেছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও গল্পকারগণ। তার মধ্যে একটি গল্প ছিল প্রেমেন্দ্র মিত্রের। লেখা 'হ্যালির বেচাল'। ছিয়াত্তর বছর পরে মহাশূন্যের বিস্ময়কর জ্যোতিষ্ক হ্যালির ধূমকেতুকে সঠিক ভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য বিজ্ঞানীদের চোখে ঘুম ছিল না।

চারটি সর্বাধুনিক মহাকাশযান পাঠানো হয়েছিল হ্যালি পর্যবেক্ষণের জন্য। ভেগা-1, ভেগা-2, প্ল্যানেট A এবং স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযান গিয়োত্তো। পরিকল্পনা অনুযায়ী বিজ্ঞানীগণ অনুমান করেছিলেন হ্যালির ধূমকেতুর কেন্দ্রীয় অংশ থেকে মাত্র 480 কিলোমিটার দূরে দাঁড়িয়ে স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযানটি তার নিরীক্ষণ কার্য চালাতে সক্ষম হবে। এই প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতেও প্রবীণ কথাশিল্পী প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর কল্পনার চোখে অন্য কিছু দেখেছিলেন। জানুয়ারি মাসে তাঁর 'হ্যালির বেচাল' গল্পে তিনি লিখেছিলেন, "ফ্রেঞ্চ গায়নার কোস্ট থেকে ছোঁড়া গিয়েত্তো হয়তো তাকে যা হুকুম করা হয়েছে তার চেয়ে আলাদা বেশি কিছু করে বসবে আর সেই ভুলের দরুণ এক হাজার কিলোমিটার দূর থেকে তার খবর নেবার বদলে সে ধূমকেতুর মাথায় ঝাঁপিয়ে ঢুঁ মেরে বসবে।" এই গল্প প্রকাশিত হবার একশ দিন পরে আমরা যখন কাগজে হ্যালি ও গিয়োত্তোর সম্পর্কের কথা জানতে পারি তখন বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাই। প্রেরিত চারটি মহাকাশযানের মধ্যে গিয়োত্তোর সঙ্গে হ্যালির সংঘর্ষ প্রেমেন্দ্র মিত্র যে কল্পনার চোখে দেখেছিলেন, ভবিষ্যতে সেটাই ঘটে যাওয়া—কল্পনার চোখে ভবিষ্যৎ ইংগিতের কি একটা বড় প্রমাণ নয়?

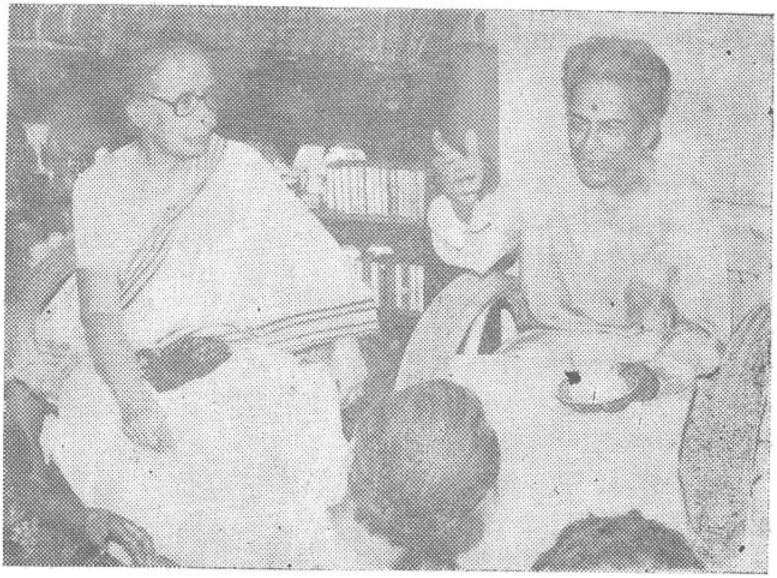

প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়ীতে কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত প্রথম বৈঠক
বাঁদিকে লীলা মজুমদার ডানদিকে প্রেমেন্দ্র মিত্র

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত ঘনাদা বিষয়ক দশটি প্রশ্নের উত্তর

1. ঘনাদার প্রথম গল্পের নাম—মশা।

2. নকল ইবন ফরিদের সঙ্গে ঘনাদার আলাপ হয়েছিল আদ্দিস আবাবায় যাবার পথে—এরোপ্লেনে।

3. ঘনাদার দাদার নেশা—নস্যি।

4. বাপী দত্তর খালি সীটে নতুন বোর্ডার নেওয়া হয়েছিল সুশীল চাকীকে।

5. ঘনাদার দ্বিতীয়বারের মহাকাশ যাত্রায় সঙ্গী ছিলেন, উন্মাদ বিজ্ঞানী লুটভিক, সুরঞ্জন ও বটুক।

6. 'ইন্দ্রলুপ্ত নিবারণী' হল টাকে চুল গজাবার একরকম তেল।

7. ই. ইউ. ডব্লিউ. সি এবং এম. বি. ডি. ও. ই. সঙ্কেত দুটির পুরো কথা হলঃ এনার্জি আন লিমিটেড ওয়ার্ল্ড কার্টেল এবং মিলিয়ন ব্যারেলস্ ডেইলি অয়েল ইকুইভ্যালেণ্ট।

8. মহাভারতে নেই এমন অনেক ঘটনাই আমরা ঘনাদার মারফত জানতে পেরেছি যার জন্য কৌরবদের পরাজয় ঘটেছে। এখানে একটি ঘটনা বলা হল। যেমন দুর্যোধন কর্তৃক উলুকের উপর কমিশারিয়েটের দায়িত্ব অর্পণ।

9. 'পার্দাচিরস মার্মোরেটাস' এক ধরনের হাঙর খেদানো মাছের নাম।

10. পেরুর ইন্কা সম্রাজ্ঞীদের 'কয়া' বলে অভিহিত করা হত। ঘনাদার পূর্বপুরুষ গানাদো' পেরু অভিযানে একটি মেয়েকে উদ্ধার করে নাম রাখেন 'কয়া'।

ঘনাদা এলো কোথা থেকে

ঘনাদা প্রসঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের হরিশ চ্যাটার্জির বাড়িতে তাঁর মুখোমুখি দুপুরের রোদ, গরম এবং প্রেমেন্দ্রবাবুর শারীরিক অসুস্থতা—সব কিছুর মধ্যে এই সাক্ষাৎকার। শারীরিক নানা অসুবিধে আর চোখ নিয়ে খুব খারাপ অবস্থার মধ্যেও প্রেমেন্দ্র মিত্র আমাদের প্রতিনিধি কিন্নর রায়কে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। এজন্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রতি রইল আমাদের কৃতজ্ঞতা।

প্রশ্ন : ঘনাদা নিয়ে লিখবেন এমন ভাবনা কিভাবে এলো, কোনো প্রস্তুতি... ?

উত্তর : আগেও বহুবার বলেছি, এখনও বলছি, ঘনাদা নিয়ে কোনো পরিকল্পনা সে ভাবে কোনো দিনই মাথার মধ্যে দানা বাঁধেনি। সায়েন্স ফিকশান লিখতাম। মনে হলো বিজ্ঞানভিত্তিক এসব গল্প তো বানিয়ে লিখি, এমন একটা চরিত্র হক না, যে বানিয়ে বানিয়ে বলে। তারপর প্রথম গল্প দেব সাহিত্য কুটিরের ছোটদের পুজো বার্ষিকীতে বেরনোর পর আর থামবার উপায় নেই। পাঠকও ঘনাদা চায়, সম্পাদকও। আসলে কি জানো আমি ইতিহাস ভালোবাসি, ভূগোল—রোমাঞ্চকর অভিযান ভীষণ ভালো লাগে, বিজ্ঞান আমার খুবই প্রিয় বিষয়। এই যে তিন ভালোবাসার সমাহার, তাই ফুটে উঠেছে ঘনাদার মধ্যে। আমার নিজের ভালোলাগা পাঠকদের ভালো লাগবে বলে বুনেছি। কি যে ভালোবাসে পাঠকেরা, তার প্রমাণ এদেশে যেমন পেয়েছি, বিদেশেও। আমেরিকা গিয়ে জানতে পারলাম বাঙালি পড়ুয়ারা খবর নেয়, দেবসাহিত্য কুটিরের পুজোবার্ষিকীতে ঘনাদা আছে কি না, থাকলে তারা অর্ডার বুক করে। একজন ইতিহাস পড়া, অনেক পণ্ডিত মানুষ, খুব বড় চাকরি করেন, তাঁর ছেলেকে ঘনাদা-কাহিনী বলেছিলেন, বাংলায় এমন গল্প লেখা হয়, ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। তুমি সব লেখাগুলো মন দিয়ে পড়বে। তবে পাঠকের সমাদর ছাড়া আর তেমন সমাদর কোথায় পেল বলো এসব লেখা! ঘনাদা অবশ্য আনূদিত হয়েছে গুজরাটি, হিন্দি এবং মালয়ালমে। ইংরেজিতেও।

প্রশ্ন : প্রথম ঘনাদা-কাহিনী কবে, কোথায় প্রকাশিত হয় ?

উত্তর : এও তো প্রায় সকলেরই জানা, তবু বলি প্রায় ষাট বছর অগে, বোধহয় 1928-29 সালে দেবসাহিত্য কুটিরের পুজোবার্ষিকীতে ঘনাদা নিয়ে প্রথম লেখা বেরয়। গল্পের নাম 'মশা'।

প্রশ্ন : ঘনাদা নিয়ে ভবিষ্যতে লেখার পরিকল্পনা কি ?

উত্তর : অনেক কিছুই তো পরিকল্পনা আছে। কিন্তু পেরে উঠছি কই ! একে তো শরীর খুব খারাপ। তার ওপর চোখে দেখতে পাই না, ব্ল্যাঙ্ক ফোল্ড লিখি। নিজের লেখা লাইন নিজেই বুঝতে পারি না। পড়ে দেয়ার লোক নেই। না পড়লে ঘনাদা লেখা অসম্ভব এতো জানোই। তবু হোমিওপ্যাথি ওষুধে চোখটা যদি একটু সেরে ওঠে তাহলে একটা বিশাল কাজ করার ইচ্ছে আছে। তোমরা তো জানো ঘনাদার গল্পে দুটো ব্যাপার—একটা ঘনাদার নিজের কাহিনী, অন্যটা ঘনাদার পূর্বপুরুষের নানা ঘটনা। ঘনাদার পূর্ব পুরুষদের নিয়ে একটা লেখার পরিকল্পনা মাথায় ঘুরছে, তবে চোখ ঠিক না হলে হবে না। আর একটা রোমাঞ্চকর ভৌগোলিক অভিযান—যা আজ পর্যন্ত কোনো ভারতীয় ভাষায় লেখা হয় নি, তার পটভূমিতে ঘনাদা-কাহিনী লেখার পরিকল্পনা আছে। সম্ভবত এটা একটা বহুদিন স্মৃতিতে থাকার মতো কাজ হবে।

প্রশ্ন : ঘনাদা কি শুধুই তরুণদের পড়ার ? মানে জোর দিতে চাইছি ঘনাদা কি কেবলই কিশোর পাঠ্য—এই প্রশ্নের ওপর।

উত্তর : মোটেই না। ঘনাদা সব বয়েসের। ঘনাদা লিখে আমি এখনও আনন্দ পাই। আর সাত থেকে সাতাশি সবাই ঘনাদার পাঠক। তারা ঘনাদাকে চায়। আসলে কি জানো, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একজন ঘনাদা আছে, যে বাগাড়ম্বর প্রিয়, কল্পনায় অনেক সাহস দেখায়। আবার-বিজ্ঞান-মনস্ক, ইতিহাস-মনস্কও। সবার ওপর অভিযান প্রিয়।

শিল্পী অজিত গুপ্তের চোখে ঘনাদা

পৃথিবী খ্যাত ফটোগ্রাফার মঁসিয়ে সুস্তেল ঘনাদাকে প্রায় চুরি করে নিয়ে যাবারই প্ল্যান করেছেন। উদ্দেশ্য জোর করে ঘনাদার কাছ থেকে একটা মানচিত্র বুঝে নেওয়া। ঘনাদার বাঁদিকে বন্দুক ডানদিকে রিভলবার উঁচিয়ে ধরা...

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং-এর সৌজন্যে

খরগোস

ঋতিংকর দত্ত

খরগোস আমাদের সকলেরই অতি পরিচিত। কিন্তু খরগোসের বিচিত্র ব্যবহারের অনেক কিছুরই আমরা খবর জানি না। বন্যপ্রাণী হওয়া সত্ত্বেও এরা আমাদের অতি নিকট। খাদ্য সংগ্রহের তাগিদেই এদের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়। এদের নিরীহ স্বভাব ও সুন্দর চেহারার জন্য এদের আমরা অনেকেই বাড়িতে রাখি। এদের পরিচিতি বিস্তারের আর একটি কারণ হলো ল্যাবরেটরিতে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য এদের ব্যবহার। অতীতে পৃথিবীর কোনো কোনো অঞ্চলে এদের দেখা গেলেও মানুষের সাহায্যে আজ এরা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।

লম্বা লম্বা কান ও বড় বড় টকটকে লাল রঙের একজোড়া চোখ দিয়ে এরা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সামনের পায়ের চেয়ে পিছনের পা লম্বা ও শক্তিশালী এবং দ্রুত দৌড়াবার ক্ষমতা নিহিত থাকে এতেই। পায়ের নিচের ঘনলোম পাথরে বা পিচ্ছিল স্থান দিয়ে দ্রুত দৌড়াবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক। স্তন্যপায়ী কিন্তু অতি নিরীহ ও ভীষণ ভীরু। আত্মরক্ষার জন্য লড়ুয়ে মনোভাব এদের মধ্যে একেবারেই দেখা যায় না—এমনকি এরা মুখে কোনো শব্দ পর্যন্ত করতে পারে না। এদের আত্মরক্ষার একমাত্র কৌশল হলো দ্রুত শত্রুর নাগালের বাইরে পালিয়ে যাওয়া। শ্রবণেন্দ্রিয় এদের খুবই প্রখর —অতি সামান্য শব্দেই এরা সজাগ হয়ে ওঠে। ভয় পেলে এরা পিছনের পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করে থপ্ থপ্ শব্দ সৃষ্টির দ্বারা সতীর্থদের সজাগ করে দেয়।

খরগোসের সমস্ত প্রজাতিই তৃণভোজী। এদের প্রিয় খাদ্য ঘাস বা প্রশস্ত পাতাযুক্ত বর্ষজীবী উদ্ভিদ। শীতকালে যখন ছোট ছোট গাছপালা পাওয়া যায় না তখন এরা গাছের ছাল খেয়ে জীবনধারণ করে। এরা যা খায়, তার চেয়ে অনেক বেশি গাছপালা কেটে কেটে নষ্ট করে—তাই কোনো স্থানের খরগোস পরিবারে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া মানে সেই অঞ্চলের গাছপালার বৃদ্ধি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। এদের হাত থেকে গাছপালা রক্ষার ব্যবস্থা কিন্তু প্রকৃতিই করে রেখেছে। পর্যবেক্ষণের সাহায্যে দেখা গেছে—কোনো স্থানের খরগোসের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পেলেই তাদের মধ্যে myxomatosis নামক একটি সংক্রামক রোগ দেখা যায়—যার ফলস্বরূপ ঐ অঞ্চলের খরগোস পরিবারের সদস্য সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পায় ও অনেক ক্ষেত্রেই ঐ অঞ্চল থেকে তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

সকল জাতের খরগোসই নিশাচর—দিনে এরা গর্তে বা নিবিড় জঙ্গলে আত্মগোপন করে থাকে এবং রাতে বের হয় খাদ্যের সন্ধানে। প্রত্যেকেরই বিচরণের একটা নির্দিষ্ট এলাকা আছে—এই এলাকার বাইরে তারা সাধারণতঃ যায় না। প্রজনন ঋতুতে পুরুষেরা একে অপরকে সহ্য করতে পারে না। দুটি পরিণত পুরুষ পরস্পরের সম্মুখীন হলেই যুদ্ধ বেধে যায়—আর সাথে সাথেই শুরু হয় লোমের ঝড়। প্রজনন কার্যের পর স্ত্রী খরগোস ভবিষ্যৎ সন্তানদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে। নিজেদের বাসার আশেপাশেই একমুখ বন্ধ ও দুই ফুট দৈর্ঘ্যযুক্ত গর্ত খুঁড়ে নেয়। খড়কুটো ও গায়ের লোম ছিঁড়ে সে তৈরি করে আঁতুড় ঘর। সন্তান প্রসবের পর গায়ের লোম ছিঁড়ে মা সন্তানদের ঢেকে দেয়। প্রতিদিন মা একবার করে সন্তানদের কাছে গিয়ে প্রায় মিনিট তিনেক ধরে তাদের দুধ দেয়। দুধ দেবার পর আবার লোম দিয়ে তাদের ঢেকে দেয় ও গর্ত থেকে বেরিয়ে গর্তের মুখ মাটি চাপা দিয়ে বন্ধ করে দেয়। এরা সাধারণতঃ একবারে তিন থেকে আটটি সন্তানের জন্ম দিতে পারে। সন্তানেরা জন্মের সময় থাকে লোমবিহীন, অন্ধ ও কালা। দিন দশ-বারোর মধ্যেই তাদের গা লোমে ঢেকে যায় এবং চোখ ফুটে যায়। প্রায় পনের-ষোল দিন পর থেকে তারা শক্ত খাবার গ্রহণ করতে শেখে। এই সময়েও মা সন্তানদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে তাদের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করে। সন্তানেরা তিন-চার মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হয়ে যায় ও পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হয়।

যশোর রোড, মতিগঞ্জ, বনগ্রাম, 24-পরগনা

কলম্বাসের বাহামা আবিষ্কার

কলম্বাস ইটালির জেনোয়ায় জন্মেছিলেন 1451 সালে। খুব বেশি এগোতে পারেন নি পড়াশুনোয়। বাবা ছিলেন তাঁতি। ও-সব কাজে মন বসত না কলম্বাসের। তাঁর দুচোখে ঢুকে পড়ত গভীর সমুদ্র, আর বড় বড় ঢেউ ভেঙে এগিয়ে যাওয়া জাহাজের স্বপ্ন। যখন 25 বছর বয়েস, তখনই লম্বা, লাল চুলের এই মানুষটি জাহাজ থেকে লাফিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে উঠেছিলেন পর্তুগালের মাটিতে।

1484-তে পর্তুগালের রাজা দ্বিতীয় জন-এর উপদেষ্টারা তাঁর অভিযানের পরিকল্পনা বাতিল করে দিলেন। সামান্য হতাশ কলম্বাস স্পেনের রাজা ও রানীর কাছে চাইলেন সাহায্য। রাজা ফার্ডিনান্ড এবং রানী ইসাবেলা তাঁর স্বপ্নকে সফল করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। বিশেষ করে রানী। অনেক টাকা-পয়সা ধনরত্ন দিয়ে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়া হলো তাঁকে। তাঁর কথাবার্তায় মুগ্ধ রাজা ও রানী আর অভিযানের বিষয় খুঁটিয়ে দেখার জন্যে নিয়োগ করলেন একদল সমুদ্র ও নৌবিশেষজ্ঞ পণ্ডিত। কিন্তু চার বছরেও তাঁরা কোনো সিদ্ধান্তে পেঁছিতে পারলেন না।

অধৈর্য কলম্বাস আবার ফিরে গেলেন লিসবনে। এর মধ্যেই ফিরে এসেছেন বিখ্যাত সামুদ্রিক পর্যটক বার্থেলমিউ দিয়াজ। তিনি এসে জানালেন, আফ্রিকা ঘুরে এশিয়ায় যাওয়ার এক জলপথ পাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কলম্বাসের বাড়া ভাতে ছাই পড়ল।

ক্লান্ত, অবসন্ন, বিষণ্ন কলম্বাস আবার ইসাবেলার কাছে ছুটে গেলেন। কিন্তু সেখানেও বিশেষজ্ঞরা রায় দিয়ে বসে আছেন এ পরিকল্পনা অসম্ভব। সেটা 1490/1491-এর শেষ দিকে কলম্বাস আবার পেঁছে গেলেন স্পেনের রাজ দরবারে। আবার নতুন করে খুলে বললেন তাঁর পরিকল্পনার কথা।

> **কলম্বাসের জাহাজ**
>
> জাহাজের নাম সান্তামারিয়া।
>
> কলম্বাস নিজেই বলেছিলেন, চওড়া, ভারি এই জাহাজের গতি কিছু মন্থর। আর অভিযানের পক্ষে এধরনের জাহাজ ঠিকমতো উপযোগী নয়। সারাই করার পর দেখা গেছে 40 জন চালকের বসার ব্যবস্থা ছিল এইখানে। ওপর থেকে নিচে পর্যন্ত ছিল পুস ডেক। ক্যাপটেনের যে জায়গা তার সঙ্গে লাগানো কোয়ার্টার ডেক। এছাড়া ছিল মূল ডেক, আর গুদাম ঘর। আত্মরক্ষার জন্যে, হয়ত বা আক্রমণের জন্যে এ জাহাজে ছিল হালকা কামান,

অবশেষে 1492-এর 7 এপ্রিল স্পেনের রাজ অনুগ্রহ পেলেন কলম্বাস অনেক হিসেব-নিকেশের পর। এ অভিযান থেকে লাভ হবে এমন বিশ্বাস জন্মানোর পরই তাঁকে সাহায্য দিলেন রাজা।

1492-র 3 আগস্ট কলম্বাস ভাসলেন সমুদ্রযাত্রায়। তাঁর বহরে তিনটি জাহাজ। সান্তা মারিয়া, পিন্টা, নিনা। পিন্টার ক্যাপটেন মার্টিন অলনজো পিনাজো, তার ভাই ভিসেন্টে ইয়ানেজ পিনাজো নিনার দায়িত্বে। সঙ্গে 90 জন পাকা, পোড়-খাওয়া সমুদ্রনাবিক। প্রায় সবাই আন্দালুসিয়ার মানুষ। আর একজন আরবি জানা মানুষও থাকল সঙ্গে। এক বছরের খাবারও রইল।

ন'দিন চলে বহর পেঁছিল ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে। ছোট-খাটো মেরামতের কাজ হলো। যোগাড় করা হলো আরও খাবার। নাবিকরা মাতল হল্লায়। সেপ্টেম্বরের 6 তারিখে ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ ছেড়ে জাহাজ চলল এগিয়ে। কলম্বাস আদেশ দিলেন—চল পশ্চিমে।

দিনগুলি, রাতগুলি কেটে যায় জাহাজ বেয়েই। তেমন জোর বাতাস থাকলে 24 ঘণ্টায় 150 মাইলও যাওয়া যায়। চারপাশে জল আর জল। একঘেয়ে ঢেউ ভাঙা। ভোরে উঠে নাবিকরা গায় প্রার্থনা সঙ্গীত। সূর্যাস্তের সময় 'Salve Regina'.

কলম্বাস কিন্তু ঠিক ঠিক হিসেব রেখে যান। কদিনে কতটা পথ এলেন পেরিয়ে।

সেপ্টেম্বর থেকেই ডাঙা কাছাকাছি এমন একটা অস্তিত্ব অনুভব করছিল নাবিকেরা। একজন নাবিক একদিন একটা কাঁকড়া ধরল। কলম্বাস আরও নিশ্চিত হলেন—কাছেই ডাঙা। 25 সেপ্টেম্বর নাবিকরা চিৎকার করে উঠল—ডাঙা, ঐ তো মাটি! ঐ তো!

কিন্তু পরদিন হারিয়ে গেল সেই মায়া-ভূমি! কোথায় কি! সব ফাঁকা। পিন্টার ক্যাপটেন পিনাজো বুঝতে পারলেন তিনি মেঘ দেখে ভুল করেছেন। এরকম ভুল তাঁর মতো বহু নাবিকই করেছেন আগে। তাঁর পরেও অনেকে।

সেপ্টেম্বর পেরিয়ে অক্টোবর এলো। তিন সপ্তাহ হয়ে গেল কোনো ডাঙার চিহ্নমাত্র নেই। নাবিকদের চুল-দাড়ি এলোমেলো। গায়ের জামায় ফুটে উঠেছে সমুদ্রের নুন। অনেকেই হতাশ। পরিশ্রমে অবসন্ন। কেউ কেউ ফিসফাস করে বলছে, দাও ফেলে ক্যাপটেনকে জলে।

কলম্বাস কিন্তু কারুর কথাই শুনছেন না। 7 অক্টোবর দেখা গেল ছোট পাখিদের ঝাঁক। শরতে পাখিরা উড়ে আসছে। কলম্বাস বললেন, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চল। পাখিদের পেছনে পেছনে। তাঁর কথামতোই ভেসে চলল জাহাজ।

পরদিন সূর্য-ওঠা ভোরে সবুজ সবুজ গাছে ঘেরা দ্বীপে একে একে নামল নাবিকেরা। মার্টিন এবং ভিসেণ্টে পিনাজোঁ নৌকোয় চড়ে পৌঁছল দ্বীপে। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা নগ্ন মানুষেরা ভিড় করে দেখতে লাগল পোশাক পরা অভিযাত্রীদের। তাদের চোখে বিস্ময়, কৌতূহল।

কলম্বাস ভারত ভ্রমে যেখানে নেমেছিলেন, তা এখনকার বাহামা দ্বীপপুঞ্জের একটি অংশ। কলম্বাসের কাছে এগিয়ে এল প্রায় বারোজন দ্বীপবাসী। প্রথম দর্শন ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। যদিও পরের ইতিহাস একেবারে অন্যরকম—রক্তে ডোবা!

10 অক্টোবর ন্যাবকরা প্রায় বিদ্রোহী হয়ে উঠল। তাদের বক্তব্য—মাইলের পর মাইল এসেও কিছুর দেখা যখন পাওয়া যাচ্ছে না, তখন আমরা ফিরে যাব। কলম্বাস কোনোরকমে শান্ত করলেন তাদের। লোভ দেখালেন সোনার।

12 অক্টোবর 'পিন্টা'র এক নাবিক রডরিগো ত্রিয়ানা চেঁচিয়ে উঠল—ঐ তো, ঐ তো মাটি। তখন রাত দুটো। চাঁদের আলোয় ফুটে ওঠা জমিকে দেখতে পেল সমস্ত নাবিকেরা। কি আনন্দ! কি আনন্দ কলম্বাসের। অন্য নাবিকদের।

কিন্নর রায়
1A, মুখার্জি পাড়া লেন, কলিকাতা-26

সিনিয়ার কুইজ কনটেস্ট

June 1986

মান : IX/X শ্রেণী মে' 1986

1. 'অম্ভি' কোথাকার রাজা ছিলেন ?
2. 'ভারতবাসীদের জন্য ভারতবর্ষ'—এই মত প্রচার করেন কে ?
3. ভারতের কোন রাজ্যে সবচেয়ে বেশি আখ উৎপন্ন হয় ?
4. কোনটি ঠিক ?
"সবুজ উদ্ভিদ অক্সিজেন উৎপন্ন করে" (ক) অন্ধকারে (খ) আলোয়।
5. শূন্যস্থান পূরণ কর :
"দুটি অ্যামিনো অ্যাসিড এক অণু জল ত্যাগ করে পরস্পর যুক্ত হয় এবং একটি—গঠন করে।"
6. মিটারের 10^9 ভাগকে কি বলা হয় ?
7. মানুষের একটি নিষ্ক্রিয় অঙ্গের নাম লেখ।
8. কোন রাসায়নিক পদার্থের দ্রবণে অক্সিজেন গ্যাস শোষিত হয় ?
9. 196 গ্রাম সালফিউরিক অ্যাসিড = কত মোল সালফিউরিক অ্যাসিড ?
10. ভলিবল নেট-এর দৈর্ঘ্য কত ?

এপ্রিল '86তে প্রকাশিত কুইজ কনটেস্টের এর সমাধান

1. বসন্ত 2. লাইপেজ 3. কোবাল্ট 4. ভ্যানাডিয়াম 5. মাইকেল ফ্যারাডে 6. জাকার্তা (ইন্দোনেশিয়াতে অবস্থিত) 7. ওয়াশিংটন, ইউ এস. এ. 8. রুমানিয়া 9. সিসমোগ্রাফ 10. ইংলণ্ড 1981-82 সালে 11. মুস্তাক আলি 12. আগ্নেয়শিলা পাললিক শিলা ও রূপান্তরিত শিলায়।

কোন গাছের পাতা ও ফুল বলতে পার ?

ফোটো কুইজ

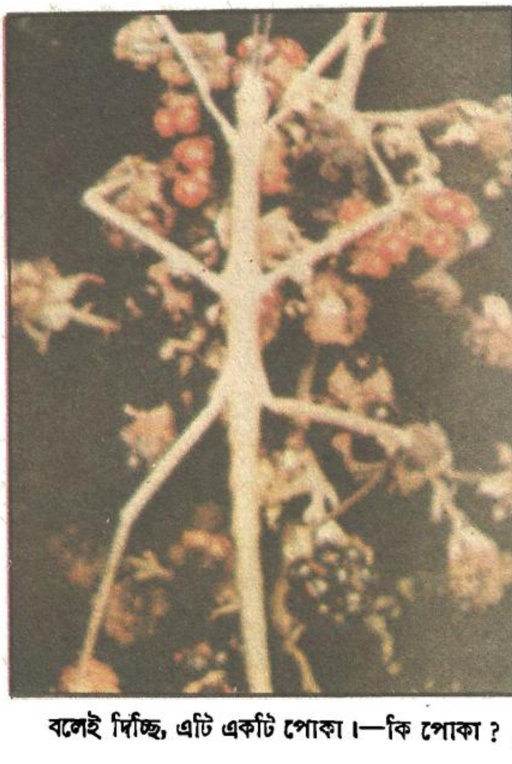

বলেই দিচ্ছি, এটি একটি পোকা।—কি পোকা ?

ঘনশ্যাম চরিতকথা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বাহাত্তর নম্বরের টঙের ঘরে যে মানুষটি হঠাৎ কোত্থেকে উদয় হয়ে দিব্যি জাঁকিয়ে বসেছেন, আর লম্বা চওড়া কথার প্যাঁচ-পয়জারে শিশির, শিবু, গৌর, মায় গোটা বিশ্বভুবনকে নিজের হাঁটুর কাছে নামিয়ে এনেছেন, তাঁর বংশ পরিচয় সে'তো মৌর্য বা মুঘল যে কোনো সাম্রাজ্যের থেকেই মহিমময়।

তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে 'দাস হলেন ঘনাদা'-র কথা। সেখানে আমি লিখেইছিলাম 1502 সালে 10টি জাহাজ নিয়ে ভাস্কো-দা-গামা আসে কালিকটে জামোরিনকে শায়েস্তা করার জন্যে। কালিকট লুট করে ছারখার করে দিল ভাস্কো। তারপর সেখান থেকে কোচিন যাওয়ার পথে যে সব জাহাজ ও সুলুপ লুট করে জ্বালিয়ে দেয়, তার মধ্যে একটি মকরমুখী পালোয়ার সদাগরী জাহাজ ছিল। যে জাহাজ সমতট থেকে সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র নিয়ে বাণিজ্য করতে গেছিল ভৃগুকচ্ছে। সেখান থেকে ফেরার পথেই সর্বনাশ। ভাস্কো দা গামার পৈশাচিক আক্রমণে সে সদাগরী জাহাজের সমস্ত মাঝি মাল্লারই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তা হয় নি। রক্ষা পেয়েছিল একটি দশ বছরের ছেলে। জ্বলন্ত সওদাগরী জাহাজ যখন ডুবছে, তখন ছেলেটি কেমন করে সাঁতরে এসে ভাস্কো দা গামারই জাহাজের হালটা ধরে আশ্রয় নেয়। একজন মাল্লা তাকে সেখানে দেখতে পেয়ে পৈশাচিক আনন্দে আরও ক'জনকে ডাকে ছেলেটিকে বন্দুক ছুঁড়ে মেরে মজা করার জন্যে। কিন্তু সেকালের ম্যাচলক্ বন্দুক। ছুঁড়তে গিয়ে বন্দুক ফেটে সেই লোকটাই পড়ে মারা। ঠিক সেই সময়ে তিনটে শুশুকের জাতের ভুগংকে জলের মধ্যে ডিগবাজি খেতে দেখা যায় জাহাজের কিছু পেছনে। দুটো ব্যাপার নিজেদের কুসংস্কারে এক সঙ্গে মিলিয়ে দৈবের অশুভ ইঙ্গিত মনে করে ভয় পেয়ে ছেলেটিকে আর মারতে তারা সাহস করে না। তার বদলে তাকে তুলে নেয় জাহাজের ওপরে।

1503 সালে ভাস্কো-দা-গামা লিসবন-এ ফেরবার পর ছেলেটি বিক্রি হয়ে যায় ক্রীতদাসদের বাজারে। সেখান থেকে দশ হাত ফেরতা হতে হতে একদিন সে কিউবায় গিয়ে পেঁছয়। দশ বছর বয়সে ভাস্কো দা গামার জাহাজে যে এসেছিল সে তখন চব্বিশ-পঁচিশ বছরের জোয়ান। জুয়ারেজ নামে কিউবায় এসে বসতি করা একটি পরিবারের সে ক্রীতদাস।

এই হচ্ছেন ঘনাদা, আমাদের ঘনশ্যাম দাসের পূর্ব-পুরুষ ঘনরাম দাসের গোড়ার কথা। নিজ মুখে ঘনাদা তাঁর নানান অভিযান, কীর্তিকাহিনী, রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন, কিন্তু কখনও বলেন নি তাঁর বংশ পরিচয়ের কথা। এ ব্যাপারে তিনি প্রায় সনাতন ধর্মের স্বয়ম্ভু। দাস পদবী ঘনরাম নিজেই নিয়েছিলেন। পালোয়ার সদাগরী জাহাজে ভৃগুকচ্ছে বাণিজ্য যাত্রা দেখে মনে হয় তিনি তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকেই যাত্রা করেছিলেন। সেকালের তাম্রলিপ্ত, এখনকার তমলুক, বন্দর হিসেবে তো যথেষ্ট খ্যাতিমান ছিল। তাঁর এই যাত্রা থেকে মনে হতে পারে, মনে হওয়া কেন, অনেকটা বোধহয় প্রমাণও হয়ে যায় প্রায় তিনি ছিলেন বঙ্গদেশের বাসিন্দা। আবার তাঁর অভিযান-যাত্রার মধ্যে যেন মনে হয় সন্দ্বীপের কথাও আছে, সুতরাং ধরে নেয়া যেতে পারে তিনি গিয়েছিলেন পূর্ববঙ্গে। কিংবা ছিলেন সেখানেও। তখনকার ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে বহু পরিবার পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ এবং উড়িষ্যার বাসিন্দা হয়েছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের পরিবার যেমন, প্রথমে উড়িষ্যা, পূর্ববঙ্গে, পরে পশ্চিমবঙ্গে। ঘনরামের বংশধর হিসেবে ঘনাদার সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মেরও যোগাযোগ থাকাই স্বাভাবিক।

ঘনশ্যাম দাস বর্ণে দ্বিজ হতে পারেন, ক্ষত্রিয় বংশেও তাঁর জন্ম হতে পারে। সওদাগরী জাহাজে সূক্ষ্ম বস্ত্র নিয়ে ঘনরামের ভৃগুকচ্ছে বাণিজ্য করতে যাওয়ার মধ্যে তাঁর বৈশ্য বংশজাত হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না।

লাতিন আমেরিকার দ্বীপ-নগর টেনচ্‌টিটলান-এ অ্যাজটেকদের হাতে বন্দী কর্টেজ আর তার মুষ্টিমেয় সৈন্য-বাহিনীকে উদ্ধার করেছিলেন 'গানাদো' ঘনরাম মস্তিষ্কের খেল্ দেখিয়ে। তিনি মন্ত্রের মতো আউড়েছিলেন বন্দী ডন কর্টেজকে শুনিয়ে শুনিয়ে—'তোমায় রথ দেখাব বলেই ভেবেছি, রথও দেখবে কলাও বেচবে।' তারপর সত্যিই রথ দেখিয়েছিলেন 'গানাদো' ঘনরাম। রথের মত কাঠের মোটা তক্তায় তৈরি দোতলা সাঁজোয়া গাড়ি। সে ঢাকা সাঁজোয়া গাড়ির দুই তলাতেই বন্দুক নিয়ে ছিল

সৈনিকেরা। নিজেরা কাঠের দেওয়ালের আড়ালে তীর বল্লম আর ইঁট পাটকেলের ঘা বাঁচিয়ে নিরাপদে বন্দুক ছুঁড়তে লাগল শত্রুর ওপরে। এই কাঠের সাঁজোয়া গাড়ির নাম হলো মাণ্টা।

সেই মাণ্টা উদ্ভাবিত না হলে কর্টেজ আর তার মুষ্টিমেয় বাহিনী সেবার দ্বীপ-নগর টেনচ্‌টিটলান থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারত না। নতুন আবিষ্কৃত আমেরিকা মহাদেশের ইতিহাসই হয়তো তাহলে পাল্টে যেত।

কর্টেজ নিজের কথা রেখেছিলেন। গানাদোকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে দামী দামী বহু উপহার সমেত সম্রাটের সওগাত বয়ে নিয়ে যাওয়ার জাহাজেই স্পেনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

পাঠাবার আগে দাসত্ব থেকে মুক্তিপত্র লিখে দেবার সময় জিজ্ঞাসা করেছিলেন—এখন তুমি মুক্ত মানুষ গানাদো। বলো কি নামে তোমায় মুক্তিপত্র দেবো ? কি নেবে তুমি পদবী ?

নাম আমার নিজের দেশের ছেলেবেলার দেওয়া ঘনরামই লিখুন—বলেছিলেন গানাদো—আর আমার বংশ যদি ভবিষ্যতে থাকে তাহলে এ ইতিহাস চিরকাল স্মরণ করার জন্য পদবী দিন দাস।

সেই মুক্তিপত্র নিয়ে ঘনরামের কিন্তু আর স্পেনে পৌঁছনো সম্ভব হয় নি। সোরাবিয়ার চক্রান্তে তাঁকে আবার হতে হলো ক্রীতদাস। তারপর পিজারোর সঙ্গে দুঃসাহসিক অভিযানে পাড়ি দিলেন পেরুতে। সেখানেও ঘনরামের জয়জয়কার। সেখান থেকে ফিরে আসা। জাহাজের ডেকে মরণপণ সংগ্রাম ঘনরামের সঙ্গে সোরাবিয়ার। ঐ জাহাজের ডেকেই বন্দিনী কয়া। ঘনরাম উদ্ধার করেছিলেন তাঁকেও।

তলোয়ার চালাতে চালাতে জাহাজের একেবারে শেষে দুজন। ঘনরাম তাঁর তলোয়ারের খোঁচায় কাটা পাল দিয়ে চাপা দিলেন সোরাবিয়াকে, সোরাবিয়া ডুবে মরল সমুদ্রে।

ঐ জাহাজের কাপতেন সানসেদো যাঁকে শ্রদ্ধাভরে মুক্তি দিয়ে গুরু বলে বরণ করেন ঋষিতুল্য পরম পণ্ডিত সেই বৃদ্ধ ভারতীয় জ্যোতিষীর অন্তিম লিপি গানাদো অর্থাৎ ঘনরাম দাস যথাস্থানে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন। কাটোয়ার কাছে ঝামটপুর নামে এক গ্রামে, কৃষ্ণদাস নামে এক সজ্জনের কাছে। সেই বৃদ্ধ জ্যোতিষী এই রকম কিছু লিখেছিলেন, ...গণনায় জানতে পারছি 1455 শকাব্দের আষাঢ় মাস সমস্ত পৃথিবীর এক দুঃসময়। বিশ্বের অনন্য এক যুগাবতার তিরোহিত হতে চলেছেন ঐ সময়ে। পারেন তো সেই পরম জ্যোতির্ময় সত্তার দীপ্ত দিব্যোন্মত্ত জীবনকথা অমর কাব্যে গেঁথে রাখবার চেষ্টা করুন। 1455 শকাব্দের আষাঢ় মাস হল 1533 খ্রিস্টাব্দের জুলাই। নীলাচলে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধান ঘটে ঐ সময়েই।

যাক সে কথা, তাহলে দেখা যাচ্ছে দাস পদবী নিজেই নিলেন ঘনরাম। আর ঐ যে 'রথ দেখাব' বলেছিলেন তিনি বন্দী কর্টেজকে, তা থেকে একটা কথা বেরিয়ে আসে। ছেলেবেলায় দেখা রথের স্মৃতিই হয়ত ঘনরামকে উদ্বুদ্ধ করেছিল একথা বলার জন্যে। আর রথ মানেই তো উড়িষ্যা, জগন্নাথের বিখ্যাত রথ। সুতরাং ধরে নেয়া যেতে পারে ঘনরামের ছোটবেলা হয়ত কেটেছিল উড়িষ্যাতেও। সেই রথযাত্রার স্মৃতি থেকেই তৈরি হলো দোতলা কাঠের সাঁজোয়া গাড়ি মাণ্টা—যা আধুনিক ট্যাঙ্কের পূর্বপুরুষ।

ঘনরামের কথা, ব্যবহার, ভেসে ওঠা স্মৃতি থেকে মনে হয় তিনি বঙ্গদেশ (পূর্ব এবং পশ্চিম), উড়িষ্যা আর মিথিলা—সমস্ত জায়গাতেই ছেলেবেলার কিছু কিছু অংশ কাটিয়েছেন। পূর্ব ভারতীয় সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে তাঁর জীবনের সঙ্গে। তিনি পূর্বভারতীয় সংস্কৃতির ফসল। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে তাঁর উত্তর পুরুষ ঘনশ্যাম দাস পূর্ব ভারতেরই মানুষ।

শিল্পী অজিত গুপ্তের চোখে 72নং বনমালী নস্কর লেনের একতলার খাবার ঘরে শিশির শিবু সুধীর গৌর ও ঘনাদা। ডানদিকে বনোয়ারি। Acute angle-এ খেতে বসে এখন abtuse angle-এ পৌঁছে ঘনাদার মেজাজ এখন শরতের আকাশের মতোই প্রসন্ন।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানীর সৌজন্যে

বিজ্ঞান সংবাদ

সর্বভারতীয় পর্যায়ে আমন্ত্রিত 25 জনের প্রতিনিধি দলে কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার তরফে যোগদান করেন শ্রী অমরনাথ রায়

বনভূমির জন্য

'সেণ্টার ফর সায়েন্স অ্যাণ্ড এনভাইরনমেণ্ট' সংক্ষেপে C. S. E. 807 বিশাল ভবন, 95 নেহরু প্লেস, নতুন দিল্লী-110019, ভারতের অনাবাদী ভূমির উন্নতিসাধন সম্পর্কিত সমস্যা এবং সেই সম্পর্কিত সরকারী নীতির উপর ভিত্তি করে একটি সুন্দর আলোচনা চক্রের আয়োজন করেছিলেন খড়্গপুরস্থ আই. আই. টি. তে এপ্রিল 13 থেকে 15 পর্যন্ত। এর আগে ঐ সংস্থা 4 ফেব্রুয়ারী নতুন দিল্লীতে এবং 28 থেকে 30 মার্চ আমেদাবাদে এই ধরনের দুটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করে। তিন দিন ব্যাপী খড়্গপুরের এই আলোচনা চক্রের মূল বিষয়বস্তু ছিল অনাবাদী ভারতীয় ভূ-খণ্ডের সদ্ব্যবহার সম্পর্কিত সরকারী নীতি, সে সম্পর্কে জনসাধারণের মতামত ও জনমত গঠন। ভারতের পূর্বাঞ্চল থেকে পঁচিশ জন সাংবাদিক এই আলোচনাচক্রে যোগদান করেন। C. S. E.-এর অধিকর্তা শ্রীঅনিল অগ্রবাল সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন এবং স্লাইড সহযোগে ভারতের বিভিন্ন অনাবাদী ভূ-খণ্ডের মোটামুটি একটি পরিচয় প্রদান করেন। তাঁর সহযোগী ছিলেন শ্রীচোপরা।

বিভিন্ন বক্তাদের মধ্যে ছিলেন আই. আই. টি. খড়্গপুরের উপ-অধিকর্তা অধ্যাপক এম. এ রামলু, পোস্ট হারভেস্ট টেকনোলজি সেণ্টারের অধ্যাপক ডঃ এন. জি ভোলে, ভারত সরকারের ওয়েস্টল্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট বোর্ডের যুগ্মসচিব অধ্যাপক সাক্সেনা, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের বন সংরক্ষণ বিভাগে যুগ্ম অধিকর্তা শ্রী উদয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে।

এই আলোচনা থেকে জানা যায় যে, প্রয়োজনের তাগিদে বা নিজেদের অজ্ঞতাবশতঃ প্রতিবছর প্রায় দেড় মিলিয়ন হেক্টর বনভূমি নির্বিচারে কেটে ফেলা হচ্ছে, অথচ সমপরিমাণ বনভূমি সৃজন করা হচ্ছে না। ফলে, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষিত হচ্ছে না। ভারতের এক বিশাল অঞ্চল এর ফলে খরা কবলিত হচ্ছে। ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা বাধ্য হয়ে যাযাবর বৃত্তি গ্রহণ করছে।

বনভূমি সৃজনের জন্য ভারত সরকার প্রতি বছর 700 কোটি টাকা ব্যয় করছেন। এছাড়া বিদেশ থেকে সাহায্য হিসেবে আসে আরও 100 কোটি টাকা। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এ টাকা অপ্রতুল। কাজেই জনসাধারণকে গাছের মূল্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে।

●বাড়ির কাছে পতিত জমিতে যত পার গাছ লাগাও, গাছের যত্ন নাও আর গাছ কেটে নষ্ট করে যারা, তারা দেশের শত্রু। দেশের ও দশের তাতে কত ক্ষতি হচ্ছে। জাতীয় এই সমস্যার সমাধানকল্পে তোমাদের ক্ষুদ্র সামর্থকে নিয়োজিত কর। প্রতিবেদক ঃ **অমরনাথ রায়**

সৌরকোষ ও তার ব্যবহার

গত 11 এপ্রিল স্থানীয় সার্কিট হাউসে মুর্শিদাবাদ জিলা বিজ্ঞান পরিষদের ব্যবস্থাপনায় একটি বিজ্ঞান আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়েছিল। আলোচনার বিষয় ছিল 'সৌর কোষ ও তার ব্যবহার'।

বিজ্ঞানমনস্ক বিশিষ্ট অতিথিবর্গ ও অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতিতে উক্ত আলোচনা চক্রে বক্তব্য রাখেন শ্রীঅনুপম বড়াল। শ্রী বড়ালের সৌরকোষের ব্যবহার ও কলাকৌশল সম্পর্কে বক্তৃতা সবাইকে উৎসাহিত করে।

অল ইণ্ডিয়া সায়েন্স টিচার্স এসোসিয়েশন-এর বার্ষিক অধিবেশন

প্রেসিডেন্সী কলেজের বেকার হলে সম্প্রতি অল ইণ্ডিয়া সায়েন্স টিচার্স এসোসিয়েশন-এর বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল। এসোসিয়েশন-এর সভাপতি ডঃ এম পি ছারা, ডঃ বি. কে গাঙ্গুলি (NC ERT), শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্ট সমাজসেবীগণ বিজ্ঞান শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে সায়েন্স অ্যাপিটিচিউড এণ্ড ট্যালেণ্ট সার্চ টেস্ট, ক্যুইজ কনটেস্ট, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ও রচনা প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের শীর্ষ স্থানাধিকারীগণকে পুরস্কার অর্পণ করা হয়। এদের মধ্যে নির্বাচিত ছ'জনকে বিশেষ 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান' পুরস্কার দেওয়া হয় শৈব্যা প্রকাশন বিভাগের পক্ষ থেকে। অন্যান্য প্রকাশনা সংস্থার পক্ষ থেকেও পুরস্কার অর্পণ করা হয়। শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তীর 'মানুষের ক্রমবিকাশ' শীর্ষক বিজ্ঞান আলোচনা খুবই আকর্ষণীয় হয়।

সায়েন্স অ্যাপ্টিচিউড এণ্ড ট্যালেণ্ট সার্চ টেস্ট—86

1986 সালের সায়েন্স অ্যাপটিচিউড এণ্ড ট্যালেণ্ট সার্চ টেস্ট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে আগামী 28 সেপ্টেম্বর 1986। এ ব্যাপারে বিস্তৃত সংবাদের জন্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ গিরি ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ 25/2 বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড কলিকাতা 19—এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ

রাতের আকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের চলাফেরা বরাবরই মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। এদের দীপ্তি ও চলাফেরা থেকেই মানুষ পার্থক্য করতে শিখল গ্রহ ও নক্ষত্রকে। হাজার হাজার বছর ধরে রাতের আকাশের দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকার পর মানুষ মাত্র 450 বছর আগে প্রথম জানতে পারলো একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে পৃথিবীসহ সবকটি গ্রহ সূর্যকে পরিক্রমণ করে চলেছে।

টাইকো ব্রাহে, কোপারনিকাশ, কেপলার, গ্যালিলিও প্রমুখ বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নিরন্তর অনুসন্ধানের ফলে আরও অনেক রহস্যের হদিশ জানতে পারা গেল।

ক্রমশঃ দূরবীণ ও মহাকাশযান আবিষ্কারের ফলে নিত্য নতুন সব চমকপ্রদ তথ্য মানুষ জানতে পারল।

এই জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার সূচনা পর্ব থেকে আজকের দিন পর্যন্ত আনুপূর্বিক ঘটনা ও তথ্যাবলীর একটি চমৎকার প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালা।

গত 3রা মে ভবনের প্রদর্শনী কক্ষে অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য। প্রদর্শনীগৃহে অসংখ্য রঙিন চিত্রে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের পরিচিতিসহ মহাবিশ্বের বস্তুসমূহের সরল ব্যাখ্যা সব রকমের বয়সের দর্শককেই আকৃষ্ট করবে। গ্রহ ও নক্ষত্রের গঠন, আকার, আকৃতি ও অবস্থান প্রভৃতির সচিত্র ব্যাখ্যায় প্রদর্শনীটি অপূর্ব।

বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালার 27তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে এগিয়ে এসেছে ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল সায়েন্স এ্যাকাডেমীর কলকাতা শাখা।

সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ সমর বাগচি জানান প্রদর্শনীটির উদ্যোগ আয়োজন করতে সময় লেগেছে প্রায় এক বছর। আলোচনাচক্রের সূত্রপাত করে ডঃ বাগচি আরও জানান যে, ভারতবর্ষে এই ধরনের প্রদর্শনী এই প্রথম আয়োজন করা হল। এবং তিনি আশা করেন, যে, সাধারণ মানুষ চির-রহস্যে ঘেরা মহাকাশ সম্পর্কে আরও সচেতন ও আগ্রহী হবেন। তিনি তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্পর্কেও আলোচনা করেন।

ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাস্ট্রোফিজিক্স, ব্যাঙ্গালোর এর ডাইরেক্টর ডঃ জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর দীর্ঘ ভাষণে

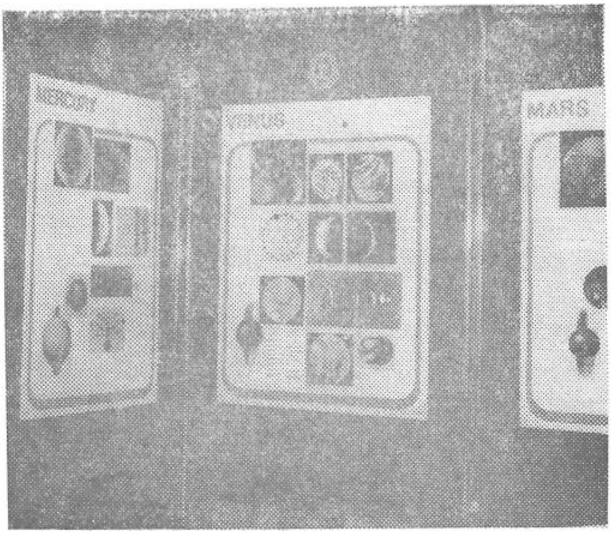

প্রদর্শনী গৃহের একাংশ

আকাশচর্চার সর্বাধুনিক তথ্য ও ব্যবস্থা সম্পর্কে বলেন। তাঁর সহজ সুন্দর বক্তৃতার সঙ্গে দুষ্প্রাপ্য রঙিন স্লাইড দেখে দর্শকগণ রোমাঞ্চ অনুভব করেন। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে বিশিষ্ট এই বিজ্ঞানী তাঁর কর্মক্ষেত্র থেকে 1977 সালে ইউরেনাস-এর বলয় আবিষ্কার করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব কেমিক্যাল বায়োলজির ডিরেক্টর ডঃ এস. সি. পাকড়াশী। প্রদর্শনীটি চলবে 29শে জুন 1986 পর্যন্ত।

ক্যুইজ প্রতিযোগিতা

মেদিনীপুর জেলাস্থ 'চাউল খোলা মুক্তাঙ্গন ক্লাব' গত 23 মার্চ, 86 থেকে 25 মার্চ, 86 পর্যন্ত তাঁদের বার্ষিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সাহু এবং শ্রীসুধাংশু পাত্র। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাবেশে ঐ তিন দিন শিশু ও যুব উৎসব পালিত হয়। উৎসবের মধ্যে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও ছিল ক্যুইজ প্রতিযোগিতা ও তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা। এ ভিন্ন ছিল যোগাসন প্রদর্শনী, গণসংগীত প্রতিযোগিতা এবং কুটীর শিল্প প্রদর্শনী। সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার প্রদান করে উৎসাহিত করা হয়।

ঘনাদার ভোজনবিলাস

লীলা মজুমদার

ভাগ্যিস ঐ নাম দেওয়া হয়েছে, তাই আমি হাতে পায়ে অনেকটা জোর পাচ্ছি। কিন্তু সম্পাদক মশাই যদি বলতেন 'ভোজন-বিলাসী ঘনাদা', তাহলে আমার পায়ের তলা থেকে মাটি কেটে নেওয়া হত আর সম্ভবতঃ আমাকে সেকালের সেই থরথরিয়া না ঝন্‌ঝিনিয়া রোগ ধরত। অবিশ্যি ঘনাদার সেই বিখ্যাত ছাইয়ের এক চিমটি দিয়ে তখনি রোগ সারিয়ে ফেলতাম। মোট কথা ঐ দুটো শিরোনামার যে এক মানে হতে পারে না, সেটাই আমার এই সামান্য এবং অতি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাতেই প্রকট হবে। যদিও ঘনাদার নিজের ব্রহ্মাণ্ডাকৃতি—ইয়ে যাকে বলা যেতে পারে বানানো গল্পের কাছে সেটি বিচি বের করে দেওরা পরমাণুর চেয়েও তুচ্ছ। আশা করি তোমরাও আমার সঙ্গে একমত যে বানানো গল্প আর মিথ্যা কথার মধ্যে কোনো মিল নেই। যে-কোনো সময়ে ঐ বানানো গল্পগুলোও অকাট্য সত্যি বলে প্রমাণ হয়ে যেতে পারে। হয়তো একটা শরণার, কি ডুমুরের বিচির, কি ঐ রকম বিনয়ী ধরনের কিছুর সাহায্যে। তোমরা কি কর না কর তার দায়িত্ব নিতে আমি অনিচ্ছুক, কিন্তু আমি আমার জীবনের অনেকটা সময় খরচ করে ঘনাদার বিষয়ে যাবতীয় গল্প, উপন্যাস, চুটকি পড়েছি এবং সব বিশ্বাস করি।

সব কথা মনে আছে তা বলছি না। বি-এ ক্লাস্‌ অবধি অংক শিখেও তো তার তিনভাগ ভুলে গেছি। কিন্তু তাতে তো আর অংকের অ-নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণ হচ্ছে না। এ-ও তাই। মোট কথা আমার বক্তব্য বিষয় হল ঘনাদার ভোজনে যথেষ্ট বিলাস থাকলেও তিনি আদৌ ভোজন-বিলাসী ছিলেন না। শুধু তাই নয়, কোন পাপিষ্ঠরা যে আসল দুষ্কৃতকারী সেটা প্রমাণ করে দেখারও আশা রাখি। 60 বছর ধরে মিছিমিছি কোন্যান ডয়েল থেকে অ্যাগাথা খৃস্টি, রেক্স স্টাউট, আর্ল স্ট্যানলি গার্ডনারদের গুলে খাইনি।

তাছাড়া এই সামান্য ও ক্ষুদ্র প্রবন্ধ যাতে ঘনাদার যোগ্য হয় তাই নতুন করে অফুরন্ত ঘনাদা, দুনিয়ার ঘনাদা, অদ্বিতীয় ঘনাদা, ঘনাদাকে ভোট দিন, ঘনাদার জুড়ি নেই, ঘনদা ও মৌকাসাবিস, এমন কি মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা মন দিয়ে পাঠ করে শুধু সময় নষ্ট করিনি। বরঞ্চ অশেষ আনন্দ এবং আমার পুরনো মতামতের পূর্ণ সমর্থন পেয়ে নিরংকার না হলেও, নিশ্চিন্ত হয়েছি।

ভাবতে পারেন মাত্র এই সাতটি বইয়ের পরিধির মধ্যে ঘনাদা ল্যাট্‌ভিয়ার রিগা, নিউ হেব্রিডিজের মিকিউদ্বীপ, আফ্রিকার তৎকালীন বেলজিয়াম কংগো, হিমালয়ের হিমাঞ্চল, দক্ষিণ মেরু, ল্যাব্রাডর, মধ্য এশিয়ার বোদ্‌রুম শহর, অস্ট্রেলিয়ার কাছকাছি বহু দ্বীপে, মায় মঙ্গলগ্রহে, মোটর বোটে, এরোপেনে লাট্টু চেপে ও অন্যান্য অভাবনীয় এবং অপটুদের আপাতদৃষ্টিতে যাকে অসম্ভব মনে হতে পারে, এমনি সব উপায়ে, অক্ষত দেহে পৌঁছে এবং অল্পবিস্তর বেশ কিছুদিন কাটিয়েও, কোনো একটি জায়গার বাসিন্দারা কি কি খায়, কিভাবে সে-সব রান্না করে কিম্বা করে না, তার বিন্দুবিসর্গও জানতে দেননি। মঙ্গলগ্রহের মতো জলশূন্য প্রান্তরের তলাকার স্ত্রীজাতি অধিবাসিনীরা কি খেয়ে সম্ভাব্য স্বামী খুঁজে বেড়াত—এমন কি তাদের

হাতে নিজের হতভাগ্য দুই সঙ্গীকে নিশ্চিন্ত মনে ফেলে রেখে এসেও, খাওয়াদাওয়ার কথাটা চেপে গেলেন ! !

তোমরাই বল, 72 নম্বর বনমালী নস্কর লেনের ঐ পুরনো বাড়িতে রান্না করা, বা সেখান থেকে লোক পাঠিয়ে ব্যবস্থা করা কলকাতার ভবানীপুরি বা কালিঘাটের উৎকৃষ্ট ভোজ্য ছাড়া, অন্য কোনো দেশের কোনো লোভনীয় খাদ্যের কথা আমাদের বলবেন না কেন? এটা কি ভোজন-বিলাসীর মতো ব্যাভার হল ?

ভোজন-বিলাসী যিনি, তিনি নিজের হাতে পাক না করলেও, যারা করবে তাদের হাড়জ্বালানি ডিটেল সহকারে, রিগা বা মিকিউ বা কংগো বা বোদরুমের এবং বিশেষ করে মঙ্গলগ্রহের পাক-প্রণালীর বিষয়ে প্রশিক্ষিত করতেন না ? ভোজন-বিলাসীদের ঐ করে কত সুখের সংসার ছারখার করে দিতে কি আমি দেখিনি ? অবিশ্যি এমনও হতে পারে যে প্রথম জীবনে ঐসব করতে গিয়েই বাড়ি থেকে তাড়া খেয়ে এমন নির্বান্ধব, পরিচয়বিহীন জীবন তাঁকে কাটাতে হচ্ছে।

ভোজন-বিলাসীরা অন্যের পছন্দকরা ভালো জিনিস পেলেই অপর্যাপ্ত পরিমাণে খেয়ে বসে থাকেন না। তাঁরা বড়ই উন্নাসিক হন যে-জিনিসটি যেমন করে রাঁধা উচিত, ঠিক তেমনটি না হলে তাঁরা ছোন না। নিজেরাও সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট পাচক হন। কি কি দরকার হবে, কি ভাবে রাঁধতে হবে. সব তাঁদের নখাগ্রে থাকে। মোটামুটি চালাক চতুর রাঁধুনে পেলে দেখতে দেখতে তাদের শিখিয়ে পড়িয়ে নেন। রান্নাঘরের তাকে দুষ্প্রাপ্য মশলা মজুত থাকে। এক্ষেত্রে তার কোনো অসুবিধাও হবে না। কারণ দাম দেবে অন্যরা চাঁদা করে। তাঁদের দেখা পেতে হলে আগে টং-এর ঘরে না গিয়ে রান্নাঘরে যেতে হয়। প্রায়ই দোকানের খাবার তাঁরা পছন্দ করেন না। কারণ কোথাকার কি তেল ব্যবহার হচ্ছে, সেটা নিয়ে মন খুঁৎখুঁৎ করে। মন খুঁৎখুঁৎ করলে খাদ্য উপভোগে বাধা পড়ে।

যে খাদ্য উপভোগ করা যায় না, বিলাসী তা ছোন না। কিন্তু প্লেট বোঝাই শিক-কাবাব, ফিশ ক্রোকেট, হরি ময়রার বাদশাহী শিঙাড়া, কালিঘাটের তোতাপুলি ল্যাংচা, প্লেটের পর প্লেট নিঃশেষ করে দিচ্ছেন ঘনাদা, এ দৃশ্য বারবার দেখতে পাচ্ছি। খেতে ভালো হলেই খেয়ে ফেলেন। কোথায় কি ভালো মাছ, কি খাসির মাংস, কি হাঁস পাওয়া যায় জানতে পারেন ঘনাদা, কিন্তু তার বেশি সব ক্রিয়া নিশ্চিন্তে অন্যের হাতে ছেড়ে দেন। আমাদের সত্যিকার ভোজন-বিলাসী বন্ধু ছিলেন অধ্যাপক শাহেদ সুরাবার্দি। তিনি সারা ইয়োরোপ ঘুরে সব দেশের খাদ্য তালিকা ও প্রস্তুতপ্রণালী শিখে এসে একটা বইও লিখেছিলেন। তাছাড়া কাউকে নেমন্তন্ন করলে একটা পদ তিনি নিজে রাঁধতেন, সেটি নিজে পরিবেশনও করতেন। তার আগের তিন রাত নাকি দুর্ভাবনায় তাঁর ঘুম হত না। ভোজনবিলাসী হতে হলে ঘনাদাকেও ঐ রকম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গজাতে হবে। ঐ বইয়ের এককপি ঘনাদাকে দিলে হয়।

তবে আমাদের মতো গেরস্তমানুষের পক্ষে তিনি ভোজনবিলাসী না হয়ে, ভোজনে যে তাঁর বিলাস ছিল, সেই বরং ভালো। বিলাসটাও অসম্পূর্ণ ছিল। কই, চীনে খাবারের নাম পাইনে কেন? অত বাংলাই আর হাফ-মোগ্লাই ভাজাভুজির জিনিস খেলে, যাদের বয়স ত্রিশের নিচে, তাদের কিছু না হলেও, মনে হয় ঘনাদাকে একটু সাবধান করে দিলে ভালো হয়। কেক, প্যাটি, পেস্ট্রি তো মেমসায়েবের বেয়ারা ঘরে ঘরে বেচতে আসত। এ-কথা তো ঘনাদার জীবনীকারের ধর্মপিতার না হক মর্মপিতার ভালো করেই জানা ছিল। তাছাড়া যারা মোকামে পর্যন্ত মাছের খোঁজে দৌড়তে পারে, তারা কালিঘাটের স্টপ থেকে নিউমার্কেটের স্টপ অবধি ট্রামে চেপে গিয়ে পুকুরপাড়ে নেমে দু-পা হেঁটে গেলে যেখানে পোঁছোত, সেখানে সেকালে শুনেছি বাঘের দুধও মিলত।

ও-সব বাদ দাও। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে তিনি খাদ্য বিশারদ না হলেও মৎস্য-বিশারদ ছিলেন। দুঃখের বিষয়, অভাবনীয় বিপদের সামনে নিজের এবং অপরের প্রাণ নিয়ে যতই ছিনিমিনি খেলুন না কেন, খাওয়াদাওয়ার বেলায় দুরন্ত অভিযাত্রীর পথ ছেড়ে, গতানুগতিকের পন্থা আঁকড়ে থাকতেন। তবে এক পাতে বসে ইলিশমাছের ঝাল ঝোল অম্বল খাবার পর, বলে বসা, 'এটা মোটেই গঙ্গার ইলিশ নয়; রূপনারায়ণের গন্ধ পাচ্ছি।' কিম্বা দুর্বল হয়ে যাচ্ছেন বলে একবেলা নলীর সুরুয়া আর এক বেলা মুরগির সুরুয়া—অন্য সব কিছুর উপর খাওয়াটাও কিছু কম বাহাদুরি নয়। বাহাদুরি কেন, আমি বলব দারুণ দুঃসাহসিকতা। ভোজনবিলাসী না হলেও ভোজনে বিলাস ছিল তো। অম্বুরী তামাক খেতেন। শিশিরের ভালো সিগারেট হাজার হাজার ফুঁকে দিতেন। ভালো জিনিসের কদর না জানলে তাই কখনো করা যায়? তবু হাঙ্গরের পাখনা চেখে দেখেননি কেন? নিদেন দু-চারটে পাখির বাসা খেতে দোষ কি ছিল?

এখন কথা হল ঐ সাতটি বইয়ের এবং আরো অনেকগুলি বইয়ের হীরো বা বীর নায়ক নিঃসন্দেহে ঘনাদা। কিন্তু, পাষণ্ড পাপিষ্ঠ শত্রু কারা?

তাদের খুঁজতেও বেশি দূরে যেতে হবে না এবং সত্যি কথা বলতে কি 72নং বনমালী নস্কর লেনের ঐ বারোমেসে এবং প্রায় 24 ঘণ্টাব্যাপী ভোজনবিলাস যজ্ঞের মূলে তারাই। ঘনাদা তিন তলার ঐ নির্জন বিলাস-

বিহীন ঘরে বসে যে আলাদীনের স্বপ্নের ভাণ্ডারের চাবি খুলে দেন, যার ফলে খেলা দেখা, চড়িভাতি করা, কিচিঙ্গে গ্রামের অনুশ্ধান, সব মুলতুবি হয়ে যায়, তার মদৎ যোগায় কারা ? তাদের নাম শিবু, শিশির, গৌর এবং বিশেষ করে ভিজে বেড়াল সুধীর এবং রামভুজ আর বনোয়ারি বলে দুটি মুখপোড়া হনুমান।

এতক্ষণ যে ভোজনবিলাসী আর ভোজনে বিলাসের মধ্যে প্রভেদ প্রমাণের প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলাম সেগুলোও এক রকম মানসিক বিলাস। সোজা কথা ঐ চারটে ছেলে দারুণ পেটুক এবং তার চেয়েও সাংঘাতিক কথা, তারা জানে যে দুনিয়ার পেটুকপনার সুবিধা নিয়ে সবাইকে দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করানো যায়। এ ক্ষেত্রে ভালো খাইয়ে ঘনাদাকে দিয়ে সর্বদুখহরা সব গল্প আদায় করা যায় এবং করা হয়ও। সেটাকে খুব খারাপ কাজ বলা যায় না, বরং অতিশয় ভালো। ঘনাদা তো আর বোকা নন যে ভালো জিনিসটে সামনে ধরে দিলে তার অপমান করবেন। দুর্নীতিপূর্ণও নন্ যে খেয়ে তার দাম দেবেন না। পরিশেষে আমার সুচিন্তিত মত হল বঙ্গ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনা হল ঘনাদার গল্প। এমন সরস ও জ্ঞানগর্ভ বই আর নেই। তার একমাত্র ত্রুটি ঘনাদা সোডা খেলেই দূর হবে।

শিল্পী অহিভূষণ মালিকের চোখে ঘনাদা

ঘনাদা তখন ইচ্ছে করেই প্যারিসের একটা শস্তা হোটেলে রয়েছেন। সেখানেই হঠাৎ মঁসিয়ে লেভির সঙ্গে দেখা। মঁসিয়ে লেভির কাছ থেকেই তিনি জানতে পারলেন বোরেগ্রার চক্রান্তের কথা। তেলের সঙ্কট তখন সারা বিশ্বে।

বাঁদিকে ঘনাদা ডানদিকে মঁসিয়ে লেভি।

আনন্দ পাবলিশার্সের সৌজন্যে

ঘনাদায়ন

অনিল কর্মকার

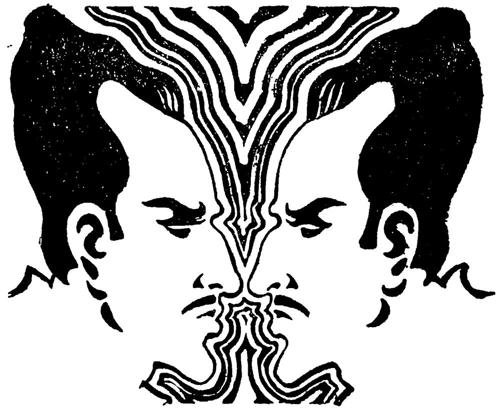

সময়ের সাথে যিনি অবিরাম পাঞ্জা লড়ছেন,
গম্বুজ খিলানের মণিময় সমারোহ গড়ছেন, তাঁর
নাম বলতো।

পৃথিবীর সব নদী এমন কি ভয়াবহ সাগরেও
যাঁর ভাসমান দেহ দেখে ভয়ে সরে যায় হাঙরেও,
তাঁর কাছে চলতো ॥

যাঁর কোন দেশ নেই পৃথিবীর সবখানে গিয়েছেন,
কোন জাতিভেদ নেই সকলকে কাছে টেনে নিয়েছেন,
তাঁর নাম জানো কি ?

পৃথিবীর সীমা ছেড়ে মঙ্গলগ্রহে তাঁর পদপাত,
মহাভারতের কালে একালীন নায়কের সংঘাত,
তাঁর কথা মানো কি ?

বিজ্ঞানে মানুষের এখনও যা বাকী আছে শেখবার,
তাঁর যাদু প্রতিভায় আর কিছু বাকী নেই দেখবার,
তাঁর জয়গান গাই।

পৃথিবীর নেতাদের চেয়ে যাঁর বুদ্ধিটা ধারালো,
অসম সাহস যাঁর সব কটি শত্রুকে হারালো,
তাঁর বাস কোন্ ঠাঁই ?

কোলকাতা নগরীর নমনীয় গাঙ্গেয় পলিতে
বাহাত্তরের এক বনমালী নস্কর গলিতে
টঙঘর জাঁকিয়ে,

মৌরসীপাট্টায় মৌজ করে কতো যুগ রয়েছেন
আমাদের ভাগ্যেতে কতো রূপে শত কথা কয়েছেন
কল্পনা হাঁকিয়ে ॥

লোভন প্লেটের ডাকে মন তাঁর উড়ে উড়ে ছুটবেই,
পৃথিবীর সব দেশে ঢের ঢের শ্রোতা তাঁর জুটবেই
নেই কোন বন্ধন,

হেন একমেব যিনি অদ্বিতীয় তাঁর স্রষ্টা
যিনি একাধারে কবি এবং ভবিষ্য দ্রষ্টা
তাঁকে অভিনন্দন ॥

অথ ঘনাদা জন্মকথা

পূর্ণেন্দু কিশোর ব্যানার্জি

ঘনাদার নামে কাঁপে সর্বচরাচর
আর কার নাম আছে তাঁহার উপর ॥
শীর্ণদেহ দীর্ঘনাক ড্যাবড্যাবে চোখ
প্রখর ব্যক্তিত্ববান নন সোজা লোক ॥
চ্যালা ও চামুণ্ডা আছে গোটা তিন চার
প্রাণপণে সেবা তারা করে ঘনাদার ॥
মুখরুচি খাদ্য পেলে বড় খুশি হন
রাগ গলে হয়ে জল হয় বিস্মরণ ॥
চ্যালারা বেফাঁস কিছু কভু যদি করে
পাঠায় খাদ্যের ভেট ঘনাদার ঘরে ॥
রামভুজ নিয়ে আসে চাপা দেওয়া ডিশ
কাটলেট হয়ে যায় নিমেষে ফিনিশ ॥
কভু আসে ফিশরোল কভু আসে ফ্রাই
ঘনাদার মুখ চলে কোনো শব্দ নাই ॥
শান্ত হলে মন তাঁর শান্ত হলে পেট
ভেট পান হাতে একটি সিগারেট ॥
এরপর খোলে তাঁর মুখের আগল
সেসব কাহিনী শুনে হয়েছি পাগল ॥
রহস্যে রোমাঞ্চে ঘেরা কত বিবরণ
কভু বা সমস্যা ছিল জীবন-মরণ ॥
সকল সময়ে তাঁর সুনিশ্চিত জয়
শত্রু হেরে ভূত হয়ে মানে পরাজয় ॥
লিখে কি ফুরাবে তাঁর জীবনের কথা
এবারে শোনাবো তাই জন্মের বারতা ॥
নদীয়ার গঙ্গাধারে ইছাপুর গ্রাম
সেথা করিতেন বাস কবি বোঁচারাম ॥
জাতিতে কায়স্থ তিনি গোত্র ভরদ্বাজ
তাঁহার দাপটে থাকে তটস্থ সমাজ ॥
তেরশো তিরিশ সালে পুজার সময়
শোনো শোনো সবে সেকি কাণ্ড হয় ॥
শুভদিনে সপ্তমীতে দ্বিপ্রহর গতে
কবিপুত্র নিল জন্ম পার্থিব জগতে ॥
পুত্র দেখে বোঁচারাম আনন্দে অধীর
পাড়া প্রতিবেশী সব করে আসে ভীড় ॥
কিছু দিনে হলো শেষ নিয়ম কানন
ঘনাদা জন্ম কথা করি বরণন ॥
বারোমাস যেতে যেতে মুখে এল বুলি
লোকে গালে হাত দেয় শিরে চোখ তুলি ॥
এরপর পিতা তাঁর বাছিলেন নাম
কালো কোলো বলে নাম দ্যান ঘনশ্যাম ॥
দেড় বছরে তাঁর হলো অন্নপ্রাশন
হাসিমুখে ঘনশ্যাম নিলেন আসন ॥
মামা তাঁর মুখে তুলে দ্যান অন্নভাত
খাইয়া চেঁচিয়ে পাড়া করিলেন মাত ॥
'মাছ কই মাছ' তিনি তীক্ষ্ণস্বরে কন
চপ ফ্রাই নাই দেখে বড় ক্ষুণ্ণ হন ॥
এভাবেই শেষ হলো শুভ অনুষ্ঠান
তাঁহার জীবন কথা পাহাড় প্রমাণ ॥
লিখে লিখে আর কতো দিব বিবরণ
এবারেতে হোক শেষ আমার কথন ॥

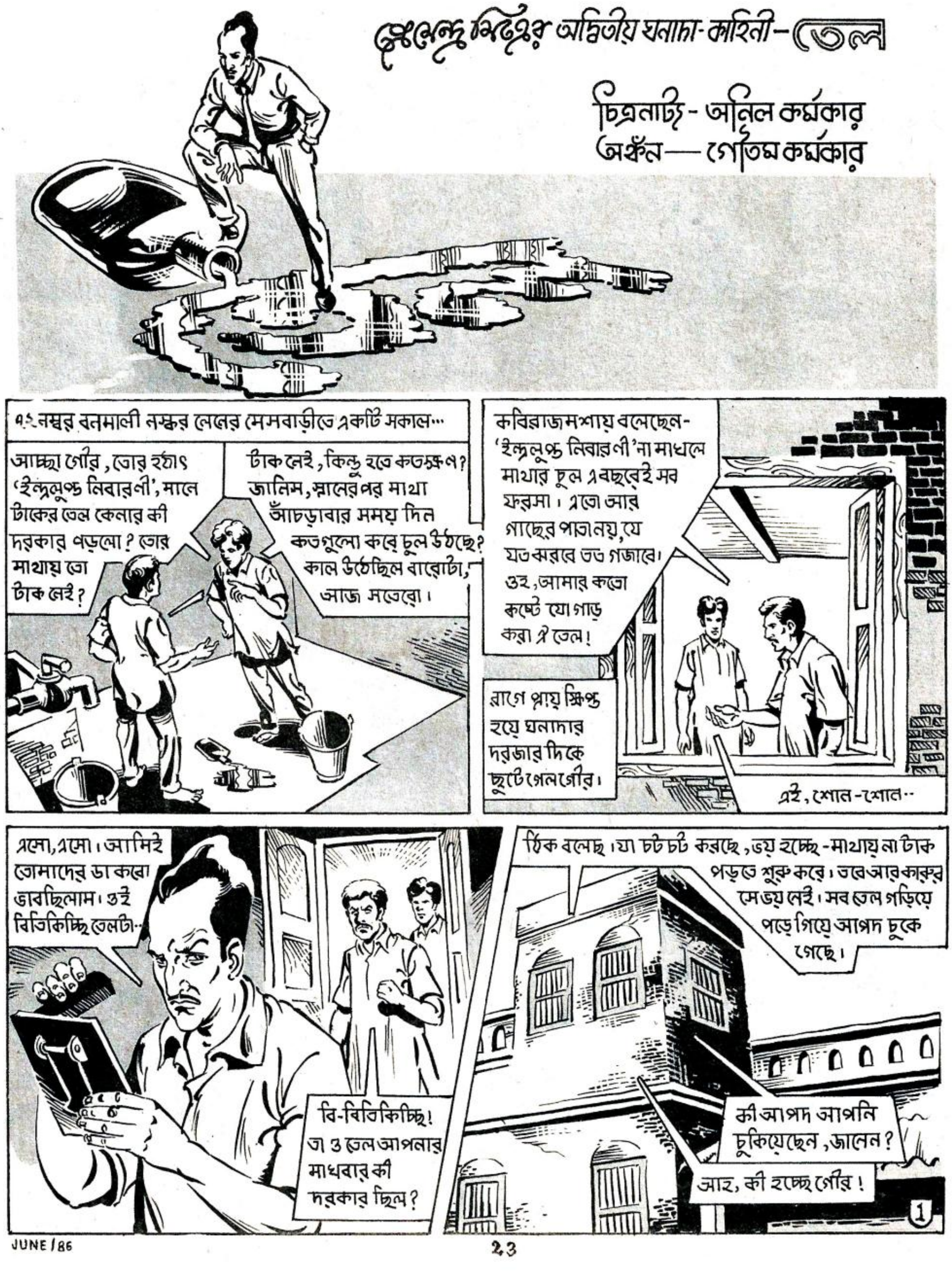
প্রেমেন্দ্র মিত্রের অদ্বিতীয় ঘনাদা-কাহিনী—তেল
চিত্রনাট্য - অনিল কর্মকার
অঙ্কন — গৌতম কর্মকার
৭২ নম্বর বনমালী নস্কর লেনের মেসবাড়ীতে একটি সকাল···
আচ্ছা গৌর, তোর হঠাৎ 'ইন্দ্রলুপ্ত নিবারণী', মানে টাকের তেল কেনার কী দরকার পড়লো? তোর মাথায় তো টাক নেই?
টাক নেই, কিন্তু হতে কতক্ষণ? জানিস, স্নানের পর মাথা আঁচড়াবার সময় দিন কতগুলো করে চুল উঠছে? কাল উঠেছিল বারোটা, আজ সতেরো।
কবিরাজমশায় বলেছেন- 'ইন্দ্রলুপ্ত নিবারণী' না মাখলে মাথার চুল এ বছরেই সব ফরসা। এতো আর গাছের পাতা নয়, যে যত ঝরবে তত গজাবে। ওই, আমার কত্তো কষ্টে যোগাড় করা ঐ তেল!
রাগে প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে ঘনাদার দরজার দিকে ছুটে গেল গৌর।
এই, শোন-শোন···
এসো, এসো। আমিই তোমাদের ডাকবো ভাবছিলাম। ওই বিতিকিচ্ছি তেলটা···
বি-বিতিকিচ্ছি! তা ও তেল আপনার মাখবার কী দরকার ছিল?
ঠিক বলেছ। যা চটচট করছে, ভয় হচ্ছে - মাথায় না টাক পড়তে শুরু করে। তবে আর কারুর সে ভয় নেই। সব তেল গড়িয়ে পড়ে গিয়ে আপদ চুকে গেছে।
কী আপদ আপনি চুকিয়েছেন, জানেন?
আহ, কী হচ্ছে গৌর!
1

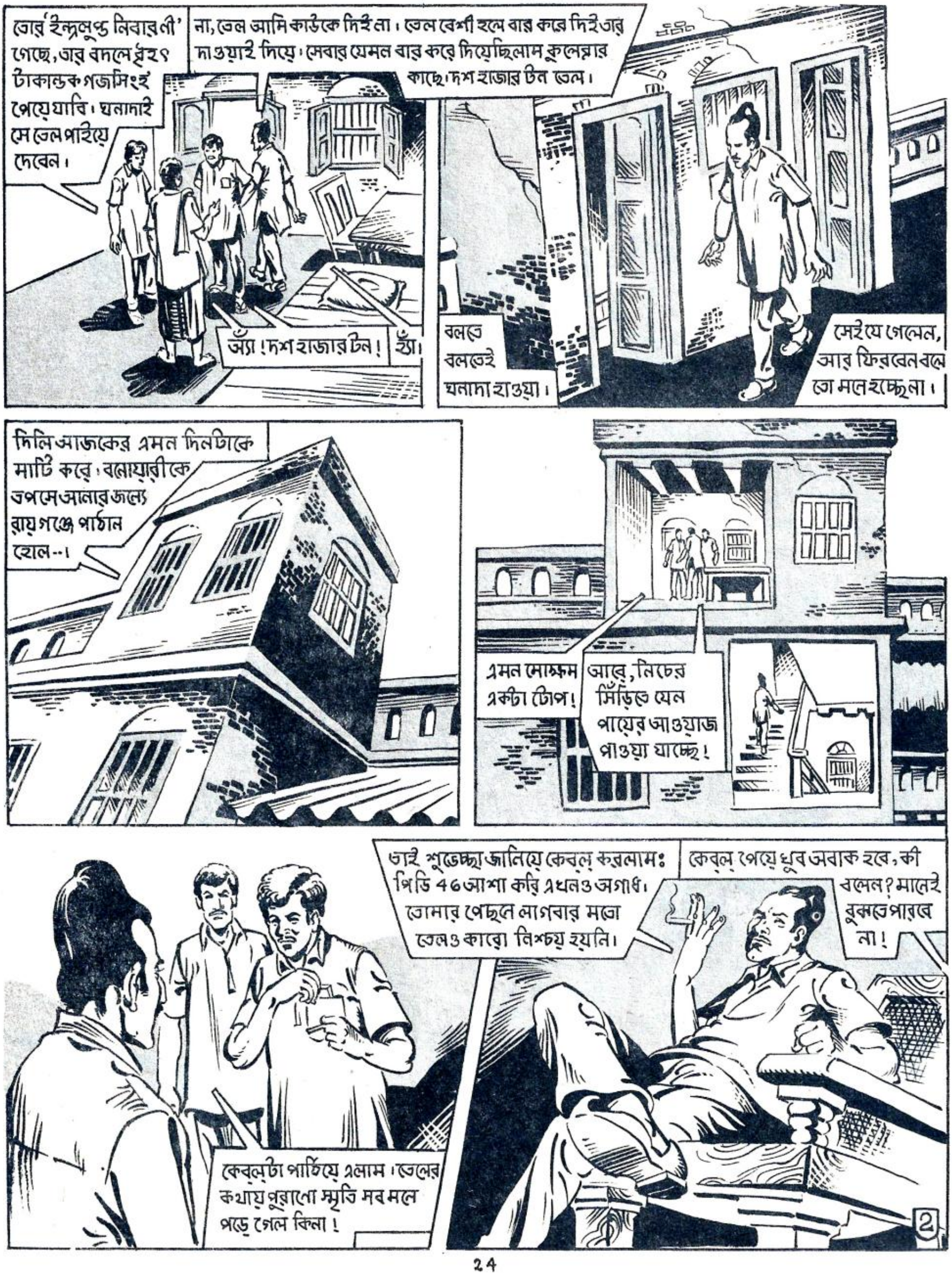
তোর 'ইন্দ্রলুপ্ত নিবারণী' গেছে, তার বদলে ধূঁহ৫ টাকান্ডক গজসিংহ পেয়ে যাবি। ঘনাদাই সে তেল পাইয়ে দেবেন।
না, তেল আমি কাউকে দিই না। তেল বেশী হলে বার করে দিই তার দাওয়াই দিয়ে। সেবার যেমন বার করে দিয়েছিলাম ক্রুশ্চেভার কাছে। দশ হাজার টন তেল।
অ্যাঁ! দশ হাজার টন!
হ্যাঁ।
বলতে বলতেই ঘনাদা হাওয়া।
সেই যে গেলেন, আর ফিরবেন বলে তো মনে হচ্ছে না।
দিলি আজকের এমন দিনটাকে মাটি করে। বনোয়ারীকে তপসে আনার জন্যে রায়গঞ্জে পাঠান হোল--।
এমন মোক্ষম একটা টোপ!
আরে, নিচের সিঁড়িতে যেন পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে!
তাই শুভেচ্ছা জানিয়ে কেবল্ করলাম: পিডি 46 আশা করি এখনও অগাধ। তোমার পেছনে লাগবার মতো তেলও কারো নিশ্চয় হয়নি।
কেবল্ পেয়ে খুব অবাক হবে, কী বলেন? মানেই বুঝতে পারবে না!
কেবল্‌টা পাঠিয়ে এলাম। তেলের কথায় পুরানো স্মৃতি সব মনে পড়ে গেল কিনা!
2

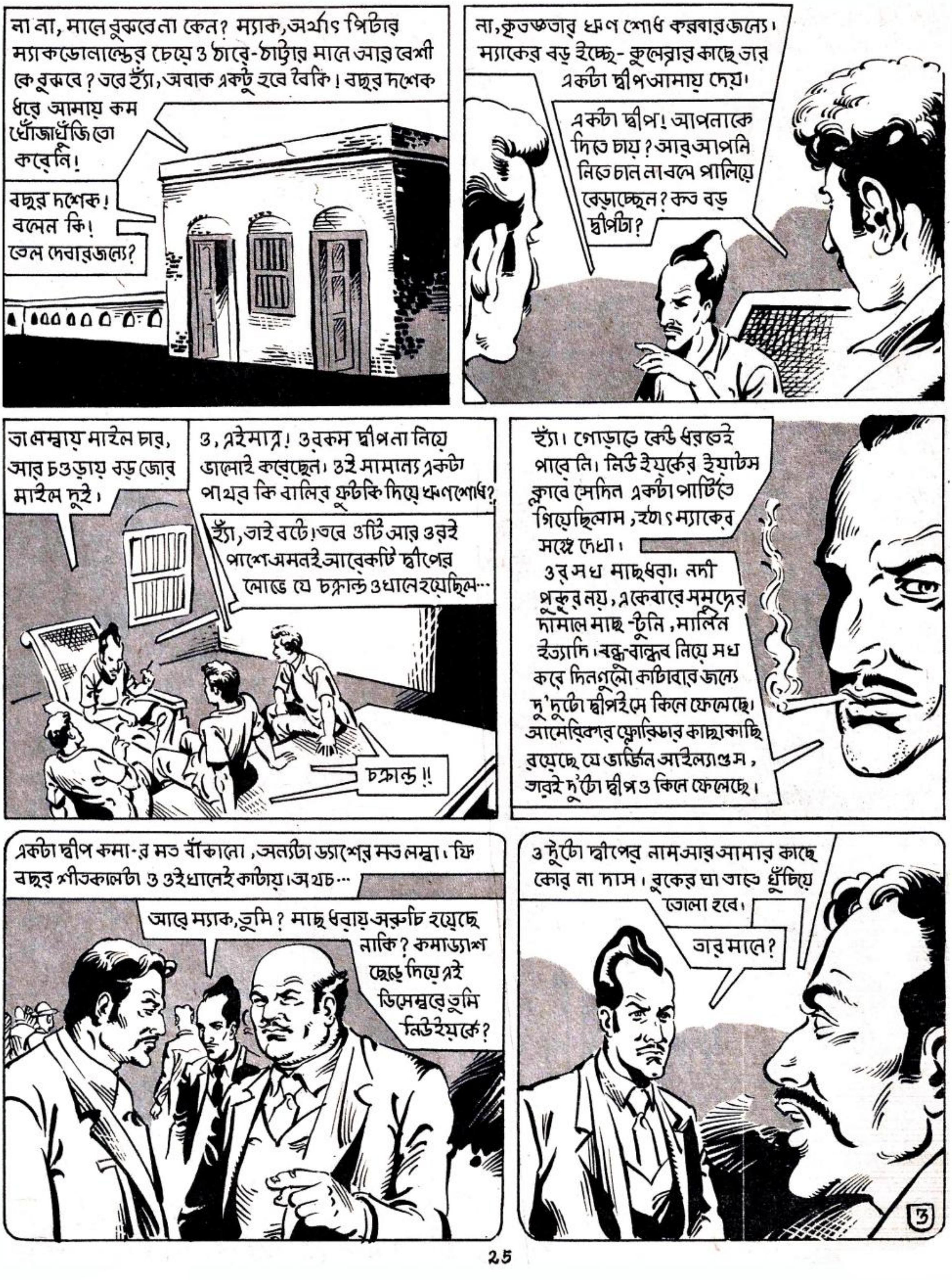
না না, মানে বুঝবে না কেন? ম্যাক, অর্থাৎ পিটার ম্যাকডোনাল্ডের চেয়ে ও চারে-চাট্টার মানে আর বেশী কে বুঝবে? তবে হ্যাঁ, অবাক একটু হবে বৈকি! বছর দশেক ধরে আমায় কম খোঁজাখুঁজি তো করেনি!
বছর দশেক! বলেন কি! জেল দেবার জন্যে?
না, কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করবার জন্যে। ম্যাকের বড় ইচ্ছে- কুলেত্রার কাছে তার একটা দ্বীপ আমায় দেয়।
একটা দ্বীপ! আপনাকে দিতে চায়? আর আপনি নিতে চান না বলে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন? কত বড় দ্বীপটা?
তা লম্বায় মাইল চার, আর চওড়ায় বড় জোর মাইল দুই।
ও, এইমাত্র! ওরকম দ্বীপ না নিয়ে ভালোই করেছেন। ওই সামান্য একটা পাথর কি বালির ফুটকি দিয়ে ঋণশোধ?
হ্যাঁ, তাই বটে! তবে ওটি আর ওরই পাশে অমনই আরেকটি দ্বীপের লোভে যে চক্রান্ত ওখানে হয়েছিল…
চক্রান্ত!!
হ্যাঁ। গোড়াতে কেউ ধরতেই পারে নি। নিউ ইয়র্কের ইয়াটস ক্লাবে সেদিন একটা পার্টিতে গিয়েছিলাম, হঠাৎ ম্যাকের সঙ্গে দেখা।
ওর সখ মাছধরা। নদী পুকুর নয়, একেবারে সমুদ্রের দামাল মাছ -টুনি, মার্লিন ইত্যাদি। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সখ করে দিনগুলো কাটাবার জন্যে দু'দুটো দ্বীপই সে কিনে ফেলেছে। আমেরিকার ফ্লোরিডার কাছাকাছি রয়েছে যে ভার্জিন আইল্যাণ্ডস, তারই দু'টো দ্বীপও কিনে ফেলেছে।
একটা দ্বীপ কমা-র মত বাঁকানো, অন্যটা ড্যাশের মত লম্বা। ফি বছর শীতকালটা ও ওইখানেই কাটায়। অথচ…
আরে ম্যাক, তুমি? মাছ ধরায় অরুচি হয়েছে নাকি? কমাড্যাশ ছেড়ে দিয়ে এই ডিসেম্বরে তুমি নিউইয়র্কে?
ও দুটো দ্বীপের নাম আর আমার কাছে কোর না দাস। বুকের ঘা তাতে খুঁচিয়ে তোলা হবে।
তার মানে?
৩

জবাব দিল ফ্রাঙ্ক ডুগান, ম্যাকের সঙ্গী। টেক্সাসের কোটিপতি ব্যবসায়ী।
সে দুঃখের কথা আর বলবেন না। আজ চারবছর হয়ে গেল, একটা চুনোপুঁটিও ওখানে ঘেঁসছে না। একটা পাখী পর্যন্ত আসে না। মনে হয়-শাপমন্যি লেগেছে।
দূর, তাও কখনো হয়? এটা হয়তো সাময়িক।
না দাস। ডুগান একদল বৈজ্ঞানিককেও ওখানে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু রহস্যের কোন কিনারা করা যায়নি। দ্বীপদু'টো অভিশপ্ত হয়ে গেছে।
ও দু'টোর রহস্য কিন্তু আমাকে জানতেই হবে। তার জন্যে আমি কিনে নিচ্ছি ও দু'টো। দর-দাম সব ঠিক হয়ে গেছে। আমার মশায় টেক্সাসের গোঁ। মাথায় জেদ যখন চেপেছে তখন শেষ না দেখে ছাড়ব না।
অপদেবতার কথাটা মিথ্যে না-ও হতে পারে।
বাঃ, আপনিও এসব কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন?
দেবতায় বিশ্বাস করলে অপদেবতাতেও করতে হয়।
সরেজমিনে তাই একটু তদারক করে আসতে চাই।
বছর কয়েক আগেও একবার গিয়েছিলাম, এবারও গেলাম।
ওরা রইলো কমাদ্বীপের আস্তানায়, আমি রইলাম ড্যাশে। একটা তাঁবু খাটিয়ে। একা।
আশ্চর্য! শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।
মনে হচ্ছে-দ্বীপের বাতাসও যেন বিষাক্ত হয়ে গেছে।
পরের দিন সকালে ওদের মোটর-বোট এসে নিয়ে গেল আমাকে।
ব্যাপার কী ডুগান, আপনাকে খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে!
উত্তেজিত হবো না? এই দেখুন।
আপনার ব্যক্তিগত নোটবুক? কী সব লেখা রয়েছে। এসবের মানে কী মিঃ ডুগান?
Pd-46
106.7
OS-76
190.8
আমিও তো তাই জানতে চাই। কে লিখেছে, আর কেনই বা লিখেছে।
ভৌতিক ব্যাপার। হাতের লেখাটা আবার আমার মতন!
আপনি কি ভূত? রাতে ড্যাশ থেকে হাত বাড়িয়ে কমায় আমার নোটবুকে হিজিবিজি কেটেছেন?
4

এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায়।

লণ্ডনে গিয়ে পড়লে আজও লোকে 205 নং বেকার স্ট্রিটের (হোমসের আস্তানার) সন্ধানে বের হন। কিন্তু 'আত্মবিস্মৃত' কলকাতাবাসীদেরই কেউ কেউ হয়ত 'বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনে'র খবরটা তেমন রাখেন না। এতে অবশ্য ঘনাদার কিছু যায় আসে না, লজ্জাটা আমাদেরই।

ঘনাদার সঙ্গে আমার পরিচয় সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরের (48)। কতই বা বয়স তখন আমার, এক দু'বছর আগেও ত মুগ্ধ হয়েছি 'পরীরা কেন আসে না' পড়ে! কিন্তু এ যেন এক নতুন চমক! মধুর ত বটেই, তবে মনোহারিত্বের চেয়েও অভিনবত্বের জৌলুসটাই যেন বেশি।

আড্ডা আর মেস এ দুটোই আজ অবলুপ্তপ্রায়। সংরক্ষণের কল্পনাও কেউ বিশেষ করেন না। কিন্তু সে সময়ে তারা উভয়েই বেশ বহালতবিয়তে বিরাজ করত! মনে আছে সেদিন কৌতূহল হয়েছিল মেসবাড়িটার হদিশ খুঁজে বের করার। তখন ত আর জানি না যে 'মেসবাড়ির ঠিকানাটা সঠিক নাও হতে পারে' (16)। মনে আছে কত তত্ত্বতল্লাসী চালিয়েছি 'পথ-নির্দেশিকা'র পাতায় পাতায়, ওল্ড বালিগঞ্জের 'বনমালী বিদ্যাসাগর লেন' থেকে শুরু করে বি. টি. রোডের ধারে 'বনমালী চ্যাটার্জী স্ট্রিট' সবাই আছেন পাতা ভরিয়ে শুধু পাতা মেলে না 'বনমালী নস্কর লেনে'রই। 'সরোবর সান্ধ্যসভা'র উল্লেখানুসারে (62) 'বাটালিঘাট' এর (বালিগঞ্জ - টালিগঞ্জ—কালিঘাট) সর্বত্রই সন্ধান চালিয়েছি, কিন্তু কোথায় 'সেই ট্রাম, বাস, লরী মোটর, রিক্সা, ঠেলা আর মানুষের ধাক্কায় টলতে টলতে ছিটকে পড়া নোংরা, সরু, আঁকাবাঁকা গলিটা, (আর কোথায়ই বা) সেই উপছে পড়া ডাস্টবিন আর ঘুঁটে লেপটানো পোড়ো বাড়ির দেয়াল বাঁচিয়ে একবার ডাইনের খাটালের সুবাসে আর একবার বাঁয়ের টিনের কারখানার ঝাঁপতাল সঙ্গীতে দিশাহারা হয়ে খাপরা আর টিনের চালের বস্তির মধ্যে থমকে দাঁড়ানো, বেঢপ, বেমানান পলস্তারা-খসা সেকেলে বাড়িটা" (15)।

রাস্তারই যেখানে হদিশ মেলে না, পাত্তা মেলে না 'কাছাকাছি নীলমণি বাজার' টারও (37), সেখানে 'বাহাত্তর নম্বরে'র খোঁজ করাটা ত বাতুলতা মাত্র। কিন্তু 'ঘরেতে এল না সে ত, মনে তার নিত্য আনাগোনা'র মতই দিনের পর দিন কল্পলোকে পেখম মেলতে থাকে "না নূতন, না পুরাতন, শক্ত ছাদের একটিমাত্র ত্রিতল নাতিপ্রশস্ত গৃহযুক্ত অট্টালিকা"টা (27)। 'বেশ বয়স্ক বাড়ি' (47) "বাড়িটার অনেক দিন ধরে পুরোপুরি সংস্কার হয় নি। খাপছাড়া তালিমারা এখানে ওখানে একটু আধটু মেরামত হয়েছে মাত্র" (10)।

'বাইরের দরজা তো হাট করে খোলাই থাকে। পুরনো আমলের খিলেন দেওয়া দেউড়ি" (5) 'নিচে রান্নাঘর, ভাঁড়ার আর খাবার ঘর' (44)। বাসিন্দা দুজন (একটি মাত্র গল্পে (63) উল্লিখিত লছমনিয়াকে বাদ দিয়ে), বনোয়ারী—যার কাজ রকমারী সুখাদ্য সযত্নে বয়ে আনা, আর রামভুজ রামভূষণ (2) নয়, ওটা ছাপার ভুল)—পাচক চূড়ামণি যার রান্নায় যাদুর হাত। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই 'দোতলার আড্ডাঘর। বেশ বড় ঘর। ঘরের মাঝামাঝি একটি আরাম কেদারা, ভাল আয়না গোটা দুই ও গোটা তিনচার চেয়ার। ডানদিকে পেছনে বাইরের বারান্দায় যাবার বড় দরজা। বারান্দায় রেলিং ও আরো দূরে ওপরে ছাদে ওঠবার ন্যাড়া সিঁড়ি (41) 'তেতালায় ন্যাড়া ছাদের ঘর' (27), 'ঘরে একটা মাত্র জানালা' (52)। আসবাব বলতে 'কেরোসিন কাঠের শেলফ' (10 আর 'একটা ভাঙ্গা তক্তাপোষ' (ঘনাদা এলেন)। 'জিনিসপত্র বলতে সাধের গড়গড়াটি বাদে একটি ছোট কম্বল জড়ানো বিছানা ও একটি পুরনো রঙচটা ঢাউস তোরঙ্গ। সেই তোরঙ্গটি সকলেরই অত্যন্ত কৌতূহলের বস্তু। তার ভেতর

কি যে আছে আর কি যে নেই, এ নিয়ে বহুদিন অনেক গবেষণা, তর্কাতর্কি হয়ে গেছে। কারুর সামনে কোনদিন এ তোরঙ্গ খুলতে ঘনাদাকে দেখা যায় নি। নিন্দুকেরা তাই এমন কথাও বলে থাকে যে, তোরঙ্গটি ঘনাদার গল্পেরই চাক্ষুষ রূপ। ওর ভেতর থেকে ঘনাদা না বার করতে পারেন এমন জিনিস নেই। কিন্তু আসলে ওটি একেবারে ফাঁকা' (48)।

'কেন যে কৃপা করে তিনি এই গলিটির ছোট্ট মেসে এসে উঠেছেন তা ঠিক বলতে পারি না' (48)। কিন্তু 'এই এঁদো গলির ঝরঝরে হাড়গোড় ভাঙ্গা বাড়ির বদলে বড় রাস্তায় প্রকাণ্ড ঝকঝকে নতুন বাড়ি পাওয়া সত্ত্বেও ঘনাদাকে অনুরোধ, উপরোধ যুক্তিতর্ক, প্রলোভন কিছুতে টলান যায় নি। তাঁর ধনুকভাঙ্গা পণ, ওই তেতালার ঘর ছেড়ে পাদমেকম ন গচ্ছামি' (15)।

বোর্ডার বলতে আমরা অবশ্য গৌর ওরফে গৌরাঙ্গ (38, শিবু শিশির আর সুধীরকেই কেবল চিনি। সুধীরই এই কাহিনীগুলির লিপিকার। নাম জাহির করার চেয়ে 'আমি' সর্বনামের আড়ালে আত্মগোপন করতেই সে বেশি ভালবাসে। তবে বিনয়ী হলেও, দুটি ঘটনা সম্পর্কে যে তার কিছুটা বিভ্রান্তি ঘটেছে সে কথাটা না জানালে সত্য গোপন করা হবে। তার একটি, সপ্তাহান্তিক ভুরিভোজের দিন তারিখে—শনিবার (6) না শুক্রবার (63)। সেটায় না হয় সে ইচ্ছে করেই গোলমাল বাধিয়ে রেখেছে। যাতে রবাহুত কেউ গিয়ে ঝামেলা না বাধায়। কিন্তু ঘনাদার অনুপস্থিতির কার্যকারণটায়? 'পবিত্র সরাই'এ পাঁচদিন নিরুদ্দিষ্ট থাকার আগে যে 'একবারই (তিনি) এ আস্তানা ছেড়ে ছিলেন' (14) কথাটায় কোন ভুল নেই। কিন্তু সেটা শিবুর জন্যে (33), 'বাপী দত্তের সময়ে' (14) নয়—তখন 'তিনি স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছেন নিজের তেতলার ঘরে' (61) যেমন আত্মনির্বাসন আগেও নিয়েছেন (26)।

ঘনাদার অনুপস্থিতিতে তাঁর তথাকথিত দাদা (33) ছাড়া তিন তিনবারই যে নতুন বোর্ডার নেওয়া হয়েছিল তা সে বিগড়ি হাঁসে অরুচি ধরানো বাপী দত্তই হোক (63, 61) কি ছাতার মালিক সুশীল চাকী (24) বা ধনু চৌধুরীই (17) হোক কেউই টিঁকতে পারে নি।

দীর্ঘ চল্লিশ বছর বাদে (1392) এতদিনে জানা গেল যে, সুবিধামতন বাড়ি পেয়ে শিশির, শিবু, গৌর আর সুধীর (আমি) মিলে (যখন) সেখানে একটা শহুরে আস্তানা বানাবার ব্যবস্থা করেছিল, (তখনই) একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগসহ (দুদিনের জন্যে) ঢুকে পড়েছিলেন ঘনাদা' (ঘনাদা এলেন)। সে 'দুদিন' অবশ্য এই চল্লিশ বছরেও ফুরোয় নি। যতদিন না ফুরোয় ততদিনই আমাদের লাভ।

ক্রমিক সংখ্যাগুলি 'গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কাহিনীসমগ্র' থেকে উদ্ধৃত।

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কাহিনী সমগ্র
সংকলন—অতসি সেন

১। আগ্রা যখন টলমল	২। আঠারো না উনিশ
৩। কাঁচ	৪। কাঁটা
৫। কাদা	৬। কেঁচো
৭। কীচক বধে ঘনাদা	৮। কুরুক্ষেত্রে ঘনাদা
৯। খাণ্ডবদাহে ঘনাদা	১০। গান
১১। গুলই ঘনাদা	১২। ঘড়ি
১৩। ঘনাদা কুলপি খান না	১৪। ঘনাদা ফিরলেন (ঘনাদার গুল)
১৫। ঘনাদাকে ভোট দিন	১৬। ঘনাদার চিঠিপত্র ও মৌকাসাবিস
১৭। ঘনাদার ধনুর্ভঙ্গ	১৮। ঘনাদার ফুঁ
১৯। ঘনাদার শল্য সমাচার	২০। ঘনাদার হিজ্ বিজ্ বিজ্
২১। ঘনাদার বচন এক, দুই, তিন	২২। চোখ
২৩। চড়ি	২৪। ছাতা
২৫। ছুঁচ	২৬। জল
২৭। জয়দ্রথ বধে ঘনাদা	২৮। টল
২৯। টুপি	৩০। টিল
৩১। তেল	৩২। তেল দেবেন ঘনাদা
৩৩। দাদা	৩৪। দাস হলেন ঘনাদা
৩৫। দাঁত	৩৬। ধুলো
৩৭। নাচ	৩৮। নুড়ি
৩৯। পরাশরে ঘনাদায়	৪০। পোকা
৪১। পৃথিবী যদি বাড়ত	৪২। পৃথিবী বাড়ল না কেন
৪৩। ফুটো	৪৪। বেড়াজালে ঘনাদা
৪৫। ভারত যুদ্ধে পিঁপড়ে	৪৬। ভাষা
৪৭। মঙ্গল গ্রহে ঘনাদা	৪৮। মশা (১৩৫২)
৪৯। মাছ	৫০। মাছি
৫১। মাটি	৫২। মাপ
৫৩। মুলো	৫৪। মৌকাসাবিস ও একবচন ও বহুবচন
৫৫। মৌকাসাবিস ও ঘনাদা	৫৬। মৌকাসাবিস থেকে বসোমালাই
৫৭। রবিনসন ক্রুশো মেয়ে ছিলেন	৫৮। লাট্টু
৫৯। শান্তি পর্বে ঘনাদা	৬০। শিশি
৬১। সুতো	৬২। সূর্য কাঁদলে সোনা
৬৩। হাঁস	

॥ সিদ্ধার্থ ঘোষ ॥

কি যে মতিচ্ছন্ন হয়েছিল, সম্পাদককে বলেছিলাম, পৃথিবীর একটা আউট লাইন ম্যাপ কিনে রাখবেন! একবারও তখন ভাবিনি এমন ফ্যাসাদে পড়ব। ভাবা উচিত ছিল। ভূগোল হাটকানো বিদ্যের জোরে টক্কর দিতে গিয়ে বাহাত্তর নম্বরের ওদের কি হাল হয়েছে সে তো জানাই।

পৃথিবীর আউটলাইন ম্যাপটায় ফুটকি বসানোর দরকার কি! এক শিশি কালি ওর উপর উল্টে দিলেই তো কম্মো সাবাড়। ফুটকি বসালেও যা হবে, কালি ঢাললেও তাই। অভিযাত্রী ঘনাদার পদচিহ্ন ওইটুকু ম্যাপের মধ্যে বসাতে গেলে সেটাই ঘটার কথা।

পৃথিবীর অংশ ধরে ধরে রিডার্স ডাইজেস্টের অমন সব পাতা জোড়া ম্যাপ, সেগুলোও দেখছি ঘনাদার বিশ্ব-পর্যটন কভার করার পক্ষে নেহাতই ছেলেখেলা।

কোনো ম্যাপেই কাজ হবে না। হবে কি ক'রে? কমা আর ড্যাশ-এর নাম কি কেউ লিখেছে কোথাও? রয়্যাল জিওগ্রাফিক সোসাইটিতে খোঁজ নিলেও কেউ বলতে পারবে না। উঁহু, ঘনাদা নিজে গেছেন সেখানে, ফেনা ছড়িয়েছেন, কাজেই থাকতেই হবে। কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না? তাহলে তো বনমালী নস্কর লেনকেও অবিশ্বাস করতে হয়! কলকাতার কোনো স্ট্রিট গাইডে নামটা নেই বলে অবিশ্বাস করবে যারা নেহাৎই আহাম্মক। তাই যদি কেউ বলে, তাহলে তাকে বিনীতভাবে না জানিয়ে উপায় নেই যে, কোনো রেলওয়ে টাইম টেবিলে বা হাওয়াই আড্ডার ফর্দে'ও কিন্তু কলকাতাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ওই কমা আর ড্যাশের ব্যাপারটাও তো তাই। নীল সমুদ্রের অসীমতায় মাটি বালি আর পাথরের ফোঁটা মাত্র। তাও তার মালিকানা আবার ব্যক্তিগত। ভূগোলের বইয়ে বা মানচিত্রে ঠাঁই পাবে কি ক'রে। তবে ভার্জিন আইল্যান্ডস নিশ্চয় খুঁজে পাওয়া যায়—ওয়েস্ট ইন্ডিজের যে বড় ছোট থেকে নেহাত ফুটকির মত সব দ্বীপের মিছিল একটু বাঁকা অর্ধচন্দ্রাকার রেখায় ট্রিনিডাড হয়ে দক্ষিণ আমেরিকা ছুঁই ছুঁই করছে, তারই মধ্যে দেখা মেলে। এই শ'খানেক দ্বীপের সমষ্টির মধ্যেই দুটি—কমা ও ড্যাশ।

এই রকম ম্যাপে খুঁজে পাওয়া যায় না বহু দ্বীপই ধন্য হয়েছে ঘনাদার আগমনে। ভূগোলে যাদের ঠাঁই নেই, ইতিহাসে তাদের স্মরণীয় করে তুলেছেন ঘনাদা। অ্যালবার্ট মার্শাল মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জের কাছে ক্যারোলাইনের একটি অ্যাটল এমন এক জায়গা—অকুল সমুদ্রের মাঝে প্রবাল দিয়ে গড়া একটা গোলাকার স্থলের বলয়ের মাঝখানে স্বপ্নের মত সায়র। কিম্বা লিমু আর নিকা, টোজা দ্বীপপুঞ্জের উত্তরে এমন দুটি ফুটকি, সাধারণ ম্যাপে অণুবীক্ষণ দিয়েও যাদের পাত্তা মেলে না। "পৃথিবীর ভূগোল কোনো দেবতার হাতের কেরামতি যদি হয়, তা হলে আলাস্কা থেকে পূর্ব সাইবেরিয়া আঁকতে যাবার সময়ে অসাবধানে তাঁর তুলির কিছু ছিটে প'ড়ে" এই সব বালির দানার মতো দ্বীপের সৃষ্টি।

তা বলে কেউ যদি মনে করে ঘনাদা শুধু বেপট জায়গাতেই দাপটে ঘুরেছেন—সে কিস্সু জানে না। দুনিয়াময় টহলদারি করছেন তিনি দু'শ বছর ধরে। নামী দামী জায়গাই বা বাদ পড়বে কেন। দুশমনরা কি বিখ্যাত শহরে গা ঢাকা দেয় না। ঘনাদা ইংলন্ডের ক্রয়ডনে পুলিশকর্তার গেস্ট হয়েছেন, প্যারিসে বেশ একটা গরিব পাড়ায় নেহাত শস্তা হোটেলের টঙের একটা অখাদ্য ঘরে বাস করেছেন, নিউ ইয়র্কে'ও একাধিক বার পদার্পণ ঘটেছে—বিশেষ ক'রে সেখানকার ইয়টস্ ক্লাবে-ই শুরু হয়েছিল তাঁর তৈল শাসনের কাজকর্ম। ওয়াশিংটনেও গেছেন তিনি, না হ'লে মেরিল্যান্ডে পৌঁছবেন কি করে। বের্লিন ও ভিয়েনাতেও গেছেন তিনি কিন্তু সেখানে তাঁর ভাইক্রোমেটিক ও স্কোটেরিথস্ ভিসনের সুরাহা হয় নি। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর শহর অগুন্তি, হিসাবের বাইরে। ল্যাটা-ভিয়ার রিগা, আদ্দিস আবাবা (যে-শহরকে তিনি গন্ধে ভালবেসেছিলেন, পোড়া ইউক্যালিপটাস কাঠের গন্ধে), সুদানের খার্তুম, কায়রো, লিব্রেভিল (গ্যাবোঁ), জোহানেস-বার্গ, পেরুর লিমা, কিউবার সান্তিয়াগো, হাইতির ক্যাপ হইতিয়েন, ত্রিনিদাদ, জর্জ টাউন (বৃটিশ গিয়েনা), দোয়ালা

ইয়াওন্দে ও ব্রেই-বোবা (বিয়ক্রিয়), ভালাস, হংকং—কত আর নাম করব।

ঘনাদার ভৌগোলিক অভিযানের বৃত্তান্ত লেখার আরেক অসুবিধা তাঁর দু'শ বছর ধরে পরিক্রমা কালে পৃথিবীর রাজনৈতিক মানচিত্রের অদল বদল। বিশেষ করে আফ্রিকার ক্ষেত্রে কথাটা সত্যি। ঘনাদা হয়তো গিয়েছিলেন কঙ্গোয়, এখন সেটা জাইরি।

আমার বন্ধু মিঠুর বাড়িতে তিরিশ বছর ধরে ন্যাশানাল জিওগ্রাফিক পত্রিকা আসছে। তার জন্য খুব গর্ব তার! কিন্তু সেদিন দুঃখ করে বলছিল, ঘনাদার কথা আজ অবধি ওরা একবারও ছাপল না। অবশ্য না-ছাপার কারণটাও মিঠু বোঝে না যে তা নয়। ন্যাশানাল জিওগ্রাফির ভাল ফোটগ্রাফ ছাড়া লেখা ছাপে না কিন্তু এমন ফোটগ্রাফার কোথায় যে ধু-ধু এক মরুভূমির মাঝখানে সমুদ্রের বাড়িয়ে ধরা নুলোর মত এক উপসাগরে ঘনাদা যখন ছিপ ফেলে বসে আছেন, তখন তার ছবি তুলবে? সাইনাই মরুভূমির গাল্ফ অফ আকাবায় সময় মতো পৌঁছতে পারবে কি!

তাছাড়া এক একবারের অভিযানে ঘনাদা প্রায় অর্ধেক পৃথিবী চক্কর মেরেছেন। যেমন, দুনিয়ার সবচেয়ে দামী রোগ চিকিৎসার পুঁথি জুদশী-র জন্য সেবার তিনি নিউইয়র্ক থেকে স্যান ফ্রান্সিসকো, টোকিও থেকে লণ্ডন, প্যারিস থেকে রিও দ্য ঝানেরো ঘুরে বেড়ালেন। আরেক-বার, নিউইয়র্ক থেকে যাত্রা শুরু করে, পেরুর লিমা হয়ে ভাড়া করা স্লুপে গ্যালাপাগস—স্কুনারে হাওয়াই—হাওয়াই থেকে ব্রিগ্যানটাইনে সামোয়া, সামোয়া থেকে কেচ-এ বারাটোহা, তারপর ইয়েল-এ ফিজি, ফিজি থেকে আবার স্লুপে নিউগিনির পোর্ট মোরেস-বি। বোঝাই যাচ্ছে কেন ঘনাদা-র পদাঙ্কানুসরণ করার চেষ্টা না করে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক কলম্বাস—টলম্বাসদের নিয়েই পাতা ভরাচ্ছে। সহজে বাজিমাত!

থার্মোমিটারের পারদ যেখানে বাষ্প হয়ে যায় এমন জায়গায়ও গেছেন ঘনাদা। কালাহারি মরুভূমি পার হয়েছেন, সুমাত্রার এক পাশে। বুকিত বরিসান পর্বত-মালার বিশাল আগ্নেয়গিরির চুড়ো থেকে লিম্যাক্স ফ্ল্যাভাস বেঁধে ছাড়া ফেলে দিয়েছেন, গেছেন সাইনাই মরুভূমিতে।

গ্রীনল্যান্ডের সবচেয়ে দক্ষিণের ঘাঁটি ফেয়ারওয়েল অন্তরীপ থেকে হাজার মাইল দূরে যেখানে পারা জমে যায়, এমন জায়গাও বাদ যায় নি। এভারেস্টের মাথায় টুপি রেখে দেওয়া আর এমন কি ঘটনা, তার চেয়েও মারাত্মক যে ওই মিয়াকনু, তাও দমাতে পারেনি তাঁকে। সাইবেরিয়ার সেই টাইগা অঞ্চলেও টক্কর দিয়েছেন। হারপুন ছোঁড়া কামান চালক হয়ে তিমি শিকারে বেরিয়ে দক্ষিণ মেরুর ক্যাম্পবেল দ্বীপে ঘাঁটি গেড়েছেন।

পাহাড়ে পাহাড়েও কত টহলদারি। অ্যাণ্ডিজ পাহাড়ের চুড়োয় উঠেছেন, ইয়েতি ধরতে এভারেস্টে দিয়েছেন হানা।

তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে অস্ট্রেলিয়া, জাপান, রাশিয়া, ইউরোপ সর্বত্রই গেছেন তিনি কিন্তু সংখ্যায় অনেক বেশি তাঁকে টেনেছে আফ্রিকার আর দক্ষিণ আমেরিকার রহস্যময় জঙ্গল, আর দুই মহাসাগর—প্যাসিফিক ও আতলান্তিকের ছিঁটে ফোঁটা বহু দ্বীপ। তুলনায়, সোসালিস্ট দেশগুলোয় তাঁর তেমন যাবার দরকার পড়ে নি। যেমন, আলবেনিয়া, চীন, চেকোস্লোভাকিয়া, পোলাণ্ড কি রুমানিয়া। হয়তো দুর্বৃত্তরা এখানে খুব পাত্তা পায় না তাই। রাশিয়ায় দু'একবার গেছেন কিন্তু রুশ দুশমনদের মোকাবিলায় নয়। ফরমোজায় যেতে হয়েছে তাঁকে কিন্তু মূল চীন ভূখণ্ডে যান নি। যান নি মানে, কাজে যান নি। বেড়াতে নিশ্চয় গেছেন। (সরকারী গেস্ট হয়ে অবশ্যই)।

কাল্পনিক মানচিত্রের কিচিন্দে গ্রামে ঘনাদাকে নিয়ে যাবার জন্য যারা ফন্দি এঁটেছিল তার চেয়েও বেশি আহাম্মুকি করেছি আমি। ঘনাদার অভিযানের রুট ম্যাপ তৈরি করার জন্য পৃথিবীর আউটলাইন মানচিত্র যোগাড় করার চেষ্টাকে, এ ছাড়া আর কি-ই বা বলা যায়। ফুটো গলে ঘনাদা গেছলেন মঙ্গলগ্রহে, এ-কথাটা ভুলে যাওয়া অমার্জনীয় অপরাধ বই কি! পৃথিবীর মানচিত্রে মঙ্গলগ্রহও নেই আর সমুদ্রের অতলে যে-সব জায়গায় ডুবুরি হয়ে তল্লাশি চালিয়েছেন তিনি তারও ঠিকানা মিলবে না।

অবশ্য অভিযাত্রী ঘনাদার যে-কোন বিবরণ, সে যত বড় রিসার্চ ওয়ার্কারই লিখুক কোন দিন সম্পূর্ণ করতে পারবে না, এটাই যা সান্ত্বনা।

মশা প্রেমেন্দ্র মিত্র / টীকা ও ব্যাখ্যা ঃ ধরণী ঘোষ

মুখবন্ধ ঃ ঘনাদা কাহিনীর সটীক সংস্করণের প্রেরণা পেয়েছি মার্টিন গার্ডনারের The Annotated Alice ও The Annotated Shark এবং উইলিয়াম এস· বেয়ারিং গোল্ড-এর The Annotated Sherlock Holmes থেকে। বেয়ারিং গোল্ড মনে করেন হোমস একজন রক্ত মাংসের মানুষ যিনি এখনও জীবিত। তাঁর স্মৃতিচারণ করেছেন বন্ধু ওয়াটসন, আর্থার কোনান ডয়ল তাঁর পরিবেশক মাত্র। প্রেমেন্দ্র মিত্রের আমি অনুরাগী ভক্ত। তবুও আমার বিশ্বাস ঘনাদা চরিতামৃতের আদি লেখক অন্য কেউ, তিনি শুধুই পরিবেশক। লেখার গৌরব ঘনাদার এক অতি বিনয়ী শিষ্য সুধীরের, যার নাম পাওয়া যায় মাত্র একবারই—"ঘনাদার হিজ-বিজ-বিজ"-এ।

মূল গল্প

গল্পটাই আগে বলব, না, গল্প যাঁর মুখে শোনা, সেই ঘনশ্যাম-দার বর্ণনা দেব, বুঝে উঠতে পারছি না।

গল্পটা কিন্তু ঘনশ্যাম-দা, (1) সংক্ষেপে ঘনাদার সঙ্গে এমন ভাবে জড়ান, যে তাঁর পরিচয় না দিলে গল্পের অর্ধেক রসই যাবে শুকিয়ে। সুতরাং ঘনাদার কথা দিয়েই শুরু করা বোধ হয় উচিত।

ঘনাদার রোগা লম্বা শুকনো হাড়-বার করা এমন এক-রকম চেহারা, যা দেখে বয়স আন্দাজ করা একেবারে অসম্ভব। পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চান্ন যে কোন বয়সই তাঁর হতে পারে। ঘনাদাকে জিজ্ঞেস করলে অবশ্য একটু হাসেন, বলেন, 'দুনিয়াময় টহলদারি করে বেড়াতে বেড়াতে বয়সের হিসেব রাখবার কি আর সময় পেয়েছি! তবে—' বলে ঘনাদা যে গল্পটা শুরু করেন, সেটা কখনো সিপাই মিউটিনির, (2) কখনো বা রুশ-জাপানের প্রথম যুদ্ধের (3) সময়কার। সুতরাং ঘনাদার বয়স আন্দাজ করা আমরা ছেড়ে দিয়েছি। শুধু এইটুকুই মেনে নিয়েছি যে গত দু'শ বছর ধরে পৃথিবীর হেন জায়গা নেই যেখানে তিনি যান নি, হেন ঘটনা ঘটেনি যার সঙ্গে তাঁর কোন যোগ নেই।

কয়েক বছর হ'ল কেন যে কৃপা করে তিনি আমাদের এই গলিটির ছোট্ট মেসে (4) এসে উঠেছেন তা ঠিক বলতে পারি না। আমাদের ছুটি-ছাটার আড্ডায় তিনি যে নিয়মিতভাবে এসে বসেন, এও তাঁর অসীম করুণা বলতে হবে। প্রায়ই অবশ্য তিনি ভয় দেখান যে পাততাড়ি গুটিয়ে আবার নিরুদ্দেশ হয়ে যাবেন, কিন্তু সাধারণতঃ সেটা মাসের শেষে, মেসের খরচের তাগাদা পড়বার সময়। বুঝে শুনে কিম্বা হতাশ হয়েই তাঁর কাছে তাগাদা করা আমরা ছেড়ে দিয়েছি। ঘনাদা আমাদের আড্ডায় এসে নিয়মিত-ভাবে ভালো আরাম-কেদারাটায় বসেন, যার ভাগ্য যেদিন

আলোচনা

1। ঘনশ্যাম-দা—ঘনশ্যাম দাসের ঊর্দ্ধতন দ্বাবিংশতম পূর্বপুরুষ ঘনরামকে পর্তুগীজ বোম্বেটেরা ধরে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাস করে রাখে। হাত বদল হতে হতে ভবিষ্যতে মেক্সিকো বিজেতা হের্ণান্দো কর্টেজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় কিউবাতে। তখন ঘনরামের নাম ছিল গানাদো। 1520 খ্রীষ্টাব্দে ট্যাঙ্ক আবিষ্কার করে তিনি কর্টেজ এবং তাঁর সঙ্গীদের প্রাণ বাঁচান। কৃতজ্ঞ কর্টেজ ঘনরামকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন। ঘনরামের ইচ্ছায়ই তাঁর পদবী দেওয়া হয় দাস। 1533 খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে; অর্থাৎ চৈতন্য-দেবের তিরোধানের সময়ে ঘনরাম দেশে ফেরেন। সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী কয়া, পেরুর লুণ্ঠিতা এক সূর্য্যসেবিকা। ঘনশ্যামের ঊর্দ্ধতন ষোড়শতম পূর্ব পুরুষ বচনরাম ছিলেন ঔরংজেবের দরবারে মীর-ঈ-ইমারৎ (বিল্ডিং সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট) সাওয়ানি নিগার (আমীর ওমরাহদের না জানিয়ে গোপন খবর সংগ্রহ করে শাহানশাহ-এর কাছে লিখে পাঠানো যার কাজ)। বচনরাম আগ্রার শহর কোতোয়াল সিদ্দি ফুলাদের একমাত্র মেয়ে ফিরোজাকে রাজপুতনার মরুভূমিতে দস্যুদের হাত থেকে উদ্ধার করেন। 1866 খ্রীষ্টাব্দের 19শে আগস্টে (1666র 29শে আগস্ট হবে; "আগ্রা যখন টলমলে" ঘনাদার ভুল)। শিবাজীর আগ্রা থেকে পালিয়ে যাওয়ার নাটকে বচনরাম এবং ফিরোজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ঘনাদার নিকট আত্মীয়দের মধ্যে এক দাদার উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে নাম অজ্ঞাত। তিনি ঘনাদাকে ডাকতেন ঘণ্টা বলে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে ঘনাদা এই দাদার সঙ্গে উত্তর মেরুর কাছে ফ্রবিশার বে-তে ছোট এক বেনামী দ্বীপে ভয়ঙ্কর কলের মাথার খোঁজে গিয়েছিলেন। ঘনাদা এই যন্ত্রটিকে একটি মাত্র প্রশ্ন করেন—গাছ আগে না বীজ

ভাল থাকে, তার কাছে সিগারেট চেয়ে নিয়ে ধরান, তারপর চোখ বুজে প্রায় ধ্যানস্থ হ'য়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ হয়তো আমাদের কোন একটা কথায় বেশ একটু উচ্চৈঃস্বরেই হেসে ওঠেন।

অপ্রস্তুত হয়ে আমরা তখন তাঁর দিকে তাকাই। ঘনাদা একটু নড়েচড়ে উঠে বসে সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে বলেন, 'কি কথা হচ্ছিল—বন্যার ?'

আমরা লজ্জিত ভাবে স্বীকার করি যে সামান্য দামোদরের বানের (5) কথা আমরা আলোচনা করছিলাম।

ঘনাদা আমাদের দিকে এমন করুণা-মিশ্রিত অবজ্ঞার সঙ্গে তাকান, মনে হয় দামোদরের বানে আমাদের নিজেদের ভেসে যাওয়াই ভালো ছিল। তারপর জিজ্ঞাসা করেন, 'টাইড্যাল ওয়েভ (6) কাকে বলে জান? দেখেছ কখনো সেই প্রলয়ের ঢেউ—যাকে বলে সমুদ্র জলোচ্ছ্বাস!'

সঙ্কুচিতভাবে স্বীকার করি যে নামটা জানলেও ব্যাপারটা সম্বন্ধে নিজেদের কোন অভিজ্ঞতা নেই।

ঘনাদা হেসে বললেন,—'কেমন করে আর থাকবে! তাহলে শোন। তখন মুক্তোর ব্যবসা করব বলে তাহিতি (7) দ্বীপে গিয়ে উঠেছি—'

ঘনাদার সেই সুদীর্ঘ চিত্তাকর্ষক গল্প থেকে জানা যায় যে কি করে এই রকম এক টাইড্যাল ওয়েভের মাথায় এক বেলায় তাহিতি থেকে একেবারে ফিজি (8) দ্বীপে গিয়ে তিনি উঠেছিলেন।

এ গল্প শোনার পর আমাদের অবস্থা কি হয়, তা বলাই বাহুল্য। দিন দুপুরে সূর্যের সামনে মিটমিটে লণ্ঠনের মত আর কি!

ঘনাদার ভয়ে আমাদের অত্যন্ত সাবধানে কথাবার্তা বলতে হয়; কিন্তু আটঘাট বেঁধে যতই কিছু বলি না কেন, ঘনাদার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। দেখা যায়, ঠিক তিনি টেক্কা দিয়ে বসে আছেন!

হয়তো কথায় কথায় কে বলেছে যে, আজকাল অনেকেরই চোখে চশমা—চোখের জোর আর বড় বেশী নেই। ঘনাদা তাঁর মার্কা-মারা হাসিটি হেসে অমনি গিয়ে উঠলেন একেবারে অ্যাণ্ডিজ (9) পাহাড়ের চূড়োয়, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাখি 'কণ্ডর' শকুনের (10) বাসার খোঁজে।

'হ্যাঁ, চোখের জোর দেখেছি বটে সেবার! অ্যাণ্ডিজ পাহাড়ের ওপর পথ হারিয়ে ফেলেছি, শীতে প্রায় জমে যাবার যোগাড়, সঙ্গে একজন আর্জেন্টাইন (11) শিকারী আর 'বোরোরো' জাতের এক সাড়ে ছ-ফুট লম্বা রেড ইণ্ডিয়ান গাইড। সন্ধ্যা হয় হয়, আর খানিকক্ষণের মধ্যে পথ না খুঁজে পেলে এই পাহাড়ের ওপরই বরফ চাপা আগে? সে বোধ হয় এত দিনে ভাবতে ভাবতে শেষ হয়ে গেছে। 1953 খ্রীস্টাব্দের শেষ দু-এক মাস ঘনাদা মেসে ছিলেন না। ফেরার দিনই এই দাদাকে হঠাৎ ঘরে দেখা যায় এবং ঘনাদার পায়ের ধুলো নিয়ে সেই দিনই তিনি চলে যান।

2। **সিপাই মিউটিনির**—শুরু 1857 খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে শেষ 1858 খ্রীষ্টাব্দের জুলাইতে। এটি নিছক সিপাহী বিদ্রোহ না ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম তা নিয়ে বিতর্ক আছে। যাঁরা মনে করেন এটি একটি গণ-অভ্যুত্থান তাঁরা মিউটিনির বদলে 'আপরাইজিং' (Uprising) শব্দটির পক্ষপাতী। রজনীকান্ত গুপ্ত তাঁর 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস'—এ (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩) লিখেছেন: (দমদমের সৈনিক নিবাসে 1857 খ্রীষ্টাব্দের) জানুয়ারী মাসের একদিন একজন নীচজাতীয় লস্কর জলপান করিবার জন্য একজন ব্রাহ্মণ সিপাহীর নিকট তাহার লোটা চায়, সিপাহী ইহাতে বিরক্ত হইয়া উঠে, এবং আপনাদের জাতির শ্রেষ্ঠত্ব জানাইয়া, লস্করকে লোটা দিতে অস্বীকার করে। লস্কর বিদ্রূপের সহিত হাসিয়া কহে, 'উচ্চজাতি ও নীচজাতি, বস্তুতঃ কিছুই নহে, সমস্তই এক হইয়া যাইবে, যেহেতু টোটা গোরু শূকরের চর্বিতে প্রস্তুত হইতেছে; এই টোটা সিপাহীদের সকলকেই ব্যবহার করিতে হইবে। সুতরাং কোম্পানীর রাজত্বে আর জাতি-বিচার থাকিবে না"। আমার বিশ্বাস এই তেজস্বী লস্কর (দাস-পদবীর লোকদের তখন নীচ-জাতি মনে করা হত) ঘনাদারই পূর্বপুরুষ।

3। **রুশ-জাপানের প্রথম যুদ্ধের**—1904 খ্রীস্টাব্দের 8ই—9ই ফেব্রুয়ারীর রাতে জাপান পোর্ট আর্থার আক্রমণ করে দু'টি রুশ যুদ্ধ জাহাজ অকেজো করে দেয়। পরে কোরীয় প্রণালীর উত্তরে রুশ ভ্লাডিভোস্টক নৌবহরটিও ধ্বংস করে। মে মাসে রুশ সৈন্যদল ইয়ালু নদীতে হেরে যায় এবং অগাস্টে জেনারেল কুরোপাটকিন (সুকুমার রায় "লক্ষ্মণের শক্তিশেল নাটকের একটি গানে এঁর কথা বলেছেন) মুকডেনের দিকে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হন। সাত মাস অবরোধের পর 1905 খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারীতে জাপান পোর্ট আর্থার নিয়ে নেয়। অক্টোবর মাসে অ্যাডমিরাল রোজ্‌দেস্ত্‌ভেনস্কির (এর কথাও "লক্ষ্মণের শক্তিশেল"-এর ঐ গানটিতে আছে) নেতৃত্বে একটি রুশ নৌবহর রওনা হয়েছিল বাল্টিক সাগর থেকে। কিন্তু 27শে মে অ্যাডমিরাল টোগো কোরীয় প্রণালীতে অবস্থিত তুসুশিমার কাছে এটিকে নিশ্চিহ্ন করে দেন।

1904 খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে রুশ আভ্যন্তরীণ

পড়ে মরতে হবে। এমন সময় আমাদের চূড়ার নিচেকার খানিকটা মেঘ একটু ফাঁক হয়ে গেল। কিন্তু বারো হাজার ফুট ওপর থেকে সেই ফাঁক দিয়ে কি আর দেখা যাবে! কিন্তু তখনো 'বোরোরো' জাতের তীক্ষ্ম দৃষ্টির কথা তো জানি না। হাত দুটো দূরবীনের মত করে সে একবার চোখের সামনে ধরলে, তারপর বললে, 'ব্যস্, আর ভয় নেই!'

অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভয় ত নেই, কিন্তু কি দেখতে পেলে তুমি?'

সে হেসে বললে, কেন, ওইত নিচে শিকারীদের তাঁবু ফেলা রয়েছে, বড় একটা কুকুর নিয়ে লাল কোট-পরা এক শিকারী এইমাত্র তাঁবুতে ঢুকল'—শুনে আমি ত অবাক্।

ঘনাদার কথা শুনে আমরা ততোধিক অবাক্ হয়ে বললাম,—'বারো হাজার ফুট ওপর থেকে লাল রঙের কোট পর্যন্ত দেখতে পেলে!'

'তা না হলে আর চোখের জোর কিসের! শকুনের চোখ কি রকম জানো? দু' মাইল ওপর থেকে ভাগাড়ের গরুর লাশ ওরা দেখতে পায়। এই বোরোরো শিকারীদের চোখ তেমনি।'

এরপর আমরা যে নির্বাক্ হয়ে গেলাম তা বলাই বাহুল্য।

প্রায় নির্বাক হয়েই আজকাল থাকি। এর ভেতর সেদিন কি থেকে বুঝি মশার (12) প্রসঙ্গ উঠে পড়েছিল। ঘনাদা তখনও এসে পৌঁছান নি। তাই বোধ হয় আমাদের অতটা সাহস। তাছাড়া ভেবেছিলাম যে সামান্য মশা মারবার ব্যাপারে ঘনাদা তাঁর কামান দাগা প্রয়োজন বোধ করবে না।

কিন্তু ভুল ভাঙতে আমাদের দেরি হোল না। বিপিন সবে তাদের গাঁয়ে কি ভাবে মশা মারবার ব্যবস্থা হচ্ছে সেই কথা তুলেছে, হঠাৎ দরজায় ঘনাদার আবির্ভাব!

'কি কথা হচ্ছিল হে?'

আমরা অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে বলি,—'নাঃ, এমন কিছু নয়, এই মশা মারবার কথা বলছিলাম।'

বিপিন তাড়াতাড়ি আরাম-কেদারাটা ছেড়ে সসম্মানে ঘনাদার জন্যে জায়গা করে দেয়।

ঘনাদা তাতে সমাসীন হয়ে শিশিরের কাছে একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে ধরিয়ে বললেন, 'ওঃ, মশা!'

আমরা কতকটা আশ্বস্ত হই। যাক ঘনাদার দৃষ্টি তাহলে মশা পর্যন্ত পৌঁছবে না। কিন্তু পরমুহূর্তেই বোমা ফাটল—যে সে বোমা নয়, একবারে 'অ্যাটমিক'!

'হ্যাঁ, মেরেছিলাম একবার একটা মশা।'

বিষয়ের মন্ত্রী প্লেহ্ভে (Plehve) বোমা বিস্ফোরণে মারা যান। ডিসেম্বরে এবং 1905 খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারীতে রাশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে হরতাল হয়। 22শে জানুয়ারী রবিবারে একজন ধর্মযাজকের নেতৃত্বে একটি মিছিল সেন্ট পিটার্সবুর্গ শহরের (বর্তমান লেনিনগ্রাড) বিখ্যাত শীত প্রাসাদে জার দ্বিতীয় নিকোলাসকে একটি আবেদনপত্র দিতে যায়। তাদের উপর গুলি চলে, মারা যায় প্রায় এক হাজার নিরস্ত্র মানুষ। পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বন্ধ হয়ে যায়। জারের কাকা এবং মস্কোর গভর্নর, গ্র্যাণ্ড ডিউক সের্গেইকে একটি বোমা টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দেয়। অবশেষে 1905 খ্রীস্টাব্দের জুনে পোটেমকিন যুদ্ধ জাহাজের বিদ্রোহী নাবিকেরা অফিসারদের হত্যা করে। এ সবই রুশ-জাপান যুদ্ধের ফল।

ঐ জুনেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে চান। 5ই সেপ্টেম্বর নিউ হ্যাম্পশায়ারের পোর্টসমাথ-এ স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়া জাপানকে পোর্ট আর্থার ছেড়ে দেয়। জাপান আরও পায় সাখালীন দ্বীপের দক্ষিণভাগ এবং দক্ষিণ মাঞ্চুরীয় রেলপথ। কোরীয়াকে বলা হয় তার আশ্রিত রাজ্য (Protectorate)। উনবিংশ শতাব্দীতে এই প্রথম ইউরোপ এশিয়ার কাছে হার মানে।

4। গলিটির ছোট্ট মেসে—এই 'আঁকাবাঁকা' গলিটির নাম বনমালী নস্কর লেন এবং এটি দক্ষিণ কলকাতার সেই 'বৃহৎ কৃত্রিম জলাশয়, "করুণ আত্মছলনায় থাকে আমরা হ্রদ বলে অভিহিত করে থাকি' তার খুব কাছে। সুধীর অবশ্যই গলিটির আসল নাম লেখেনি। বেহালায় একটি বনমালী নস্কর রোড আছে তবে ঘনাদা নিশ্চয়ই সেখান থেকে রবীন্দ্র সরোবরের সান্ধ্য অধিবেশনে হেঁটে আসতে পারেন না। বাড়ীর নম্বর নিয়েও সংশয় আছে। 'টিঙ্গ' কাহিনীতে বলা হয়েছে বারো আর 'শিশি' বা পরবর্তী অ্যাডভেঞ্চারে বাহাত্তর। 'তেতলার একটি চোর-কুঠরি গোছের ঘরে ঘনাদা একা থাকেন।' সামনের ছোট একটু খোলা ছাদে একটি 'roof garden' করে বিশ্বের খাদ্য সমস্যা মেটানোর একবার চেষ্টা করা হয়েছিল। ঘরের দেওয়ালে মেঝের কাছে একটি কোণে একটা পেনসিল গলাবার মত ছোট একটা ফুটো দেখা দিয়েছিল। সেই সুবাদেই আমরা ঘনাদার প্রথম মঙ্গলগ্রহ অভিযানের কথা জানতে পারি। সদাশিব বাড়িওয়ালাকে চটাবার বা কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে মামলার আসামী হওয়ার ঝুঁকি নিয়েও সুধীর ও তার বন্ধুরা দক্ষিণের দেওয়ালে একটা

আমরা স্তম্ভিত ! ঘনাদা মশার প্রসঙ্গও বাদ দিতে চান না দেখে নয়, স্তম্ভিত, তাঁর এই অবিশ্বাস্য বিনয়ে। মশা-ই যদি মারতে হয়, তাহলে ঘনাদা মাত্র একটি মশা মারবেন, এ যে কল্পনাও করা যায় না !

শিশির সাহস করে বলেই ফেলল—'একটি মশা মেরেছিলেন !'

'হ্যাঁ, একটিমাত্র মশা-ই জীবনে মেরেছি।' আমাদের হতবুদ্ধি করেই ঘনাদা বলে চললেন—'মেরেছি 1939 (13) সালের 5ই আগস্ট, সাখালীন (14) দ্বীপে !'

আমরা ফ্যাল-ফ্যাল করে তাঁর দিকে চেয়ে আছি দেখে একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, 'সাখালীন দ্বীপের নাম শুনেছ, কিন্তু কিছুই জানো না—কেমন? দ্বীপটা জাপানের উত্তরে সরু একটা করাতের মত উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বি হয়ে পড়ে আছে। তার দক্ষিণ দিক্‌টা ছিল জাপানীদের, আর উত্তরটা রাশিয়ার। সেই দ্বীপের পুব-দিকের সমুদ্রকূলে তখন অ্যাম্বার (15) সংগ্রহ করবার একটি কোম্পানির হয়ে কাজ করছি। এমন অখাদ্য পাণ্ডববর্জিত জায়গা দুনিয়ায় আর আছে কি না সন্দেহ। বছরের অর্ধেক সেখানে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ে, আর বাকি অর্ধেক বরফে সব জমে যায়। তার ওপর আছে ভীষণ তুষার-ঝড় আর গাঢ় জমাট কুয়াসা। কোন রকমে দামী কিছু অ্যাম্বার সংগ্রহ করেই সেমুখো আর হব না এই ছিল মতলব, কিন্তু সে আশায় ছাই পড়ল। আমাদের কোম্পানির তানুলিন নামে এক চীনা মজুর একদিন সকালে হঠাৎ নিরুদ্দেশ ; তার সঙ্গে এ পর্যন্ত যা অ্যাম্বার যোগাড় হয়েছিল, সেই মহামূল্য থলিটাও।

সাখালীন দ্বীপটি ত নেহাত ছোটখাট নয়, তার বেশির ভাগ আবার জঙ্গল আর পাহাড়। সে সব পাহাড়-জঙ্গলের অনেক জায়গায় মানুষের পায়ের চিহ্নই পড়েনি। সুতরাং এই দ্বীপে কাউকে খুঁজে বার করা সোজা নয়। তবে একটা আশার কথা ছিল এই যে, অ্যাম্বারের মত দামী রত্ন চুরি করে সাখালীন দ্বীপে লুকিয়ে থেকে কারুর লাভ নেই। সেই চোরাই মাল বেচতে তাকে কোন বড় সভ্য দেশে যেতেই হবে। আর সাখালীন দ্বীপ ছেড়ে এপ্রিল থেকে অক্টোবরের মধ্যে কাউকে যেতে হলে প্রধান শহর অ্যালেক্‌জ্যানড্রোভস্‌ক্ (16) থেকে ব্লাডিভস্টকের (17) স্টীমার না ধরে উপায় নেই। অক্টোবরের পরে অবশ্য সমুদ্রে জমে বরফ হয়ে যায়। তখন লুকিয়ে কুকুর-টানা স্লেজে করে পালান সম্ভব। কিন্তু তার আগে প্রধান স্টীমার-ঘাটায় কড়া নজর রাখবার ব্যবস্থা করলে চোর কিছুতেই সাখালীন থেকে বেরুতে পারবে না। অক্টোবর

জানালা ফোটাতে রাজী হয়েছে। 'মাপ' আর 'পোকা'র সঙ্গে প্রকাশিত অজিত গুপ্তের আঁকা ছবি থেকে জানা যায় ঘনাদার ঘরে আছে একটি হাঁড়ি, দুটি তোরঙ্গ, একটি টুল, একটি চেয়ার, একটি তক্তপোশ (যার তলায় তিনি একবার লুকিয়ে ছিলেন ; 'কাঁচ' দ্রষ্টব্য), একজোড়া বিদ্যাসাগরী চটি, শেল্ফ, আলনা, হুঁকোর কলকে, মাথার চিরুনি, নখের নরুণ, সেলাই-এর ছুঁচ আর কান খুশকি কাঠি (ঘনাদা কানে দিয়েই বুঝতে পারেন ঢেউ কম না বেশি)। এছাড়া আছে টাইওয়ানের হাতুড়ে ডাক্তার চিংস্থন-এর তৈরি চশমা, প্রেসবাইওপিয়া (চালশে) আর ডাইক্রোম্যাটিক-ভিশন-এর (রং কানা) নিদান। ঘনাদার বাঁধানো দাঁতের দৌলতে কোবাল্ট বোমার গোপন অঙ্ক শত্রুপক্ষের হাতে পড়তে পড়তে বেঁচে যায়। আর সাউথ জর্জিয়াতে কেনা একটি ছুরি না থাকলে তিনি দক্ষিণ মেরুর গরমে গলে পচে মরতেন।

শিল্পী প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখে ঘনাদা

অনেক কষ্ট ও পরিশ্রম করে গৌরের সংগ্রহ করা দুর্লভ 'ইন্দ্রলুপ্ত নিবারণী' তেল ঘনাদা মাথায় শুধু মেখে নয়, পুরো তেলের শিশিটাই উল্টে ভেঙে দিয়ে সব তেল নষ্ট করেছেন। যদিও গৌর, শিবু, সুধীর ও শিশিরের কাছে তাঁর বক্তব্য ঃ "ও তেল নষ্ট হয়ে ভালই হয়েছে। ওটা মাথায় মাখার তেলই নয়।"

দেবসাহিত্য কুটির প্রকাশিত, বেনুবীণা-1374 বঙ্গাব্দ

মেসের আড্ডাঘর দোতলায়। 'মাছ' সংলগ্ন অজিত গুপ্তের ছবি অনুসারে এখানে আছে ঘনাদার মৌরসী-পাট্টা আরাম কেদারা, একটি টাইমপিস ও কিছু বই। অন্য

পর্যন্ত তাকে খ্‌ুজে বার করবার সময় অন্ততঃ আমরা পাব।

বেতারে অ্যালেক্‌জ্যান্‌দ্রোভস্‌ক্‌-এর প্‌ুলিসের কাছে সমস্ত খবর পাঠিয়ে আমি ও আমাদের ক্যাম্পের ডাক্তার মিঃ মার্টিন দ্‌ুজন কুলি নিয়ে তান্‌লিনের খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম।

কয়েকদিন জলা-জঙ্গলে ঘ্‌ুরে ঘ্‌ুরে যখন প্রায় হতাশ হয়ে উঠেছি, তখন হঠাৎ ভাগ্যক্রমে একটা হদিশ পেয়ে গেলাম।

টিয়ারা (18) পাহাড়ের কাছে সেদিন সন্ধ্যায় আমরা তাঁব্‌ু ফেলেছি। ওখানকার আদিম গিলিয়াক জাতির এক শিকারীর কাছে সকাল বেলায় একটা উড়ো খবর পেয়েছিলাম যে, এই দিক্‌ দিয়ে একজন চীনাকে যেতে দেখা গেছে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত সে খবরে বিশ্বাস করবার মত কোন প্রমাণ পাই নি।

রাত্রে তাঁব্‌ুর মধ্যে ঘ্‌ুমোন একরকম অসম্ভব। সাখালীন দ্বীপে বড় হিংস্র জানোয়ার বলতে শ্‌ুধ্‌ু ভাল্‌ুক ছাড়া আর কিছ্‌ু নেই। সাধারণতঃ তারা মান্‌ুষকে আক্রমণ করে না, কিন্তু দিনে মাছি ও রাত্রে মশা যা আছে, তা হিংস্র জানোয়ারকে হার মানায়। আমি আর মিঃ মার্টিন তাই কোন রকমে ঘ্‌ুমোতে না পেরে তখন বাইরে এসে দাঁড়িয়ে গল্প করছি। হঠাৎ চমকে উঠে বললাম, 'দেখেছেন মিঃ মার্টিন !'

মিঃ মার্টিনের দ্‌ৃষ্টিও সেদিকে তখন গেছে। অবাক্‌ হয়ে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ ! বেশ জোরালো আলো বলে মনে হচ্ছে। এই জনমানবহীন জায়গায় ওরকম আলো আসছে কোথা থেকে ? ভুতুড়ে ব্যাপার নাকি !'

খানিকক্ষণ লক্ষ্য করে বললাম, 'না, ভুতুড়ে নয়, বেশ স্বাভাবিক ব্যাপার। দ্‌ূরের ওই পাহাড়ে ঢিবিটার পেছনে নিশ্চয় কোন একটা বাড়ি আছে—এ আলো সেখান থেকেই আসছে।'

মিঃ মার্টিন অবাক্‌ হয়ে বললেন, 'কিন্তু এখানে শখ করে অমন বাড়ি করবে কে ? গিলিয়াক, ওরোক বা টুঙ্গ্‌ুস জাতের অসভ্য শিকারী ছাড়া এ অঞ্চলে ত কেউ আসে না। এদিকে কোন খনি ইদানীং হয়েছে বলেও জানি না।'

ব্যাপারটা সম্বন্ধে কৌত্‌ূহল যত বেশিই হোক, সন্ধান নেবার জন্যে সকাল পর্যন্ত আমরা নিশ্চয় অপেক্ষা করতাম, কিন্তু সেই ম্‌ুহ্‌ূর্তে রাত্রির স্তব্ধতা হঠাৎ এক অমান্‌ুষিক চীৎকারে যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল।

একবার আমি ও মিঃ মার্টিন দ্‌ুজনে দ্‌ুজনের ম্‌ুখের দিকে চাইলাম, তারপর ভেতর থেকে টর্চটা বের করে এনে কোন কথা না বলেই বেরিয়ে পড়লাম। একেবারে নিরস্ত্র

আসবাবপত্রের হদিশ পাওয়া যায়নি, যেমন যায়নি অন্য বাসিন্দাদের ঘরের বিবরণ। সব মিলিয়ে কটি ঘর আছে বলা শক্ত। প্রতিটি ঘরে কজন করে থাকেন তাও অজ্ঞাত। তবে বাসিন্দাদের সংখ্যা সাতের কম নয়। সাত নম্বর সীটের প্রথম বোর্ডার বাপি দত্ত হাঁসের পেটে ভারী জলের ম্যাপ খুঁজত। সে ছেড়ে যাওয়ার পর আসে সুশীল চাকী, যার ছাতা ঘনাদা আরেক জনকে দান করতে বাধ্য হন। অন্যদের মধ্যে সুধীর ছাড়া নাম পাওয়া যায়, শিবু, শিশির আর গৌরের দেবু যাকে। 'মাছি'তে মিশরী মৌলবী সাজানো হয়েছিল, বোধ হয় মেসে থাকে না। মেসের ঠাকুর রামভুজ আর ফাই ফরমাস খাটে বনোয়ারী। এদের কল্যাণে শনিবার রাত্রে এবং রবিবার দুপুরে ('নাচ' দ্রষ্টব্য) খাওয়ান ভালই হয়। বাসন মাজে ঝি লছুমনিয়া।

5. **দামোদরের বান**—1948 খ্রীস্টাব্দে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে নদীতে আর বন্যা হয় না। তিলাইয়া, কোনার, মাইথন এবং পাঞ্চেত-এ এখন বাঁধ আর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র হয়েছে। দুর্গাপুরে একটি ব্যারেজ আর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে। বোকারো এবং চন্দ্রপুরাতেও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র হয়েছে।

6. **টাইড্যাল ওয়েভ**—প্রধান কারণ দু'টি—ঝড় এবং ভূমিকম্প। 1787 খ্রীস্টাব্দে পূর্ব ভারতে একটি ঝড়ের পর সমুদ্রের জল 20 মাইল ভেতরে চলে এসেছিল; মৃত্যু হয়েছিল 10,000 লোকের। এরপর থেকে বিভিন্নধর্ম সমুদ্রজলোচ্ছ্বাসের বছর, স্থান এবং মৃতের সংখ্যা সমেত একটি তালিকা দেওয়া হল : 1896—সানরিবু (জাপান)—22,000 ; 1900—গ্যালভেস্টন (টেক্সাস)—6,000 ; 1915—গ্যালভেস্টন—300 ; 1946—হাওয়াই—173 ; 1960—আতাদির (মরোক্কো)—12,000 ; 1960—পূর্ব পাকিস্তান—10,000 ; 1978—আকায়ুটলা (এল সালভাদোর)—100। ঘনাদার জন্য প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণে এক টাইড্যাল ওয়েভ দেখা দিয়েছিল '1937 সালের 17ই সেপ্টেম্বর' ('ঘড়ি' দ্রষ্টব্য)।

7. **তাহিতি দ্বীপে**—দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়ার প্রধানতম দ্বীপ। রাজধানী পাপীতে, লোকসংখ্যা 1983-র হিসেবে 15,220। তাহিতির উর্বর উপত্যকায় প্রচুর কলা, আপেল, কমলালেবু আর নারিকেল জন্মায়। এছাড়া কফি, ক্যাকাও (যার থেকে কোকো হয়), আখ এবং তুলোর চাষ হয়। অধিবাসীরা মূলতঃ ধর্মান্তরিত খৃষ্টান। দ্বীপটির আয়তন 600 বর্গ মাইল।

যে আমরা ছিলাম না তা বোধ হয় বলবার দরকার নেই। দুজনের কোমর-বন্ধেই পিস্তল আঁটা ছিল।

যে পাথুরে ঢিবিটার পেছন থেকে আলো দেখা যাচ্ছিল, সেটা খুব বেশি দূরে নয়, প্রায় শ তিনেক গজ হবে। ঢিবিটার পাশ দিয়ে ঘুরে যাবার পরই দেখা গেল আমাদের অনুমান ভুল হয় নি। একটা মাঝারি গোছের বাড়ির একটা জানলা থেকে উজ্জ্বল আলোটা দেখা যাচ্ছে।

আশ্চর্যের কথা এই যে, অমানুষিক যে চীৎকার আমরা শুনেছিলাম, তা একবার উঠেই একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে। চারিধার এমন শান্ত যে দুজনে এক সঙ্গে সে শব্দ না শুনলে মনের ভুল বলেই সেটা গণ্য করতাম।

বাড়িটার কাছে এসে তখন আমরা বেশ একটু ফাঁপরে পড়েছি। এখন করা যায় কি! আজানা জায়গায় সম্পূর্ণ অপরিচিত এক বাড়িতে হঠাৎ মাঝরাতে এসে ডাকাডাকি করাটা মোটেই সুবিধের হবে না, তা বুঝতে পারছিলাম; কিন্তু ফিরে যাওয়া ত তখন আর যায় না।

যে জানালাটা দিয়ে আলো আসছিল সেখানে গিয়ে সাবধানে একবার উঁকি দিলাম। মস্তবড় একটা ঘর, মিউজিয়াম যেমন থাকে অনেকটা সেইরকম। প্রকাণ্ড একটা কাঁচে ঘেরা টেবিল ঘরটার মাঝখানে বসান। সে কাঁচের ভিতর কি আছে দেখতে পেলাম না। লোকজনও কেউ সেখানে নেই। এতে রাত্রে থাকবার কথাও নয়।

সেখান থেকে সরে এসে দরজায় ধাক্কা দেব কি না ভাবছি, এমন সময় পেছন থেকে সরু অথচ তীক্ষ্মকণ্ঠে ইংরেজীতে এক আদেশ শুনলাম, 'প্রাণে বাঁচতে চাও ত হাত তোল—'

চমকে ফিরে দাঁড়িয়ে দেখি, বেঁটে-গোছের জোয়ান একটি লোক আমাদের দিকে পিস্তল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পেছনে লম্বা-চওড়া যমদূতের মত চেহারার এক প্রহরী; তারও হাতে পিস্তল।

ব্যাপারটা বেশ নাটুকে হয়ে জমে উঠেছিল বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরস্পরের পরিচয় পাওয়ার পর সব আবার থিতিয়ে সহজ হয়ে গেল।

পিস্তল হাতে যিনি আমাদের হাত তুলতে বলেছিলেন, জানতে পারলাম, তিনি মিঃ নিশিমারা নামে একজন জাপানী কীটতত্ত্ববিদ্। সাখালীনের কীটপতঙ্গ নিয়ে গবেষণা করবার জন্য এই ঘাঁটিটি বসিয়েছেন। আমরা কি উদ্দেশ্যে তাঁর বাড়িতে হানা দিয়েছিলাম শোনবার পর লজ্জিত হয়ে তিনি আমাদের কয়েকদিন তাঁর ওখানে থেকে তাঁর কাজকর্ম দেখে যেতে অনুরোধ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে এ আশ্বাসও দিলেন যে পলাতক চীনা মজুরের সন্ধান তাঁর

8. **ফিজি দ্বীপে**—প্রকৃতপক্ষে এটি প্রায় 832টি ছোট বড় দ্বীপের সমষ্টি। অবস্থান দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে নিউ জিল্যাণ্ডের প্রায় 1,100 মাইল উত্তরে। প্রায় 100টি দ্বীপে লোকের বসবাস আছে। 1983 তে লোকসংখ্যা ছিল 6,71,712 যার শতকরা 50 ভাগ ভারতীয়। মোট আয়তন 7,072 বর্গ মাইল। বর্তমান প্রধান মন্ত্রীর নাম রাতু ম্যর কামিসেসে মারা। ফিজি 1874 থেকে 1970 পর্য্যন্ত বৃটেনের কলোনি ছিল। 1970-এর 10ই অক্টোবর স্বাধীনতা পেয়ে কমনওয়েলথের সদস্য হয়।

9. **অ্যাণ্ডিজ**—মূল স্প্যানীশ নাম করদিলিয়ারা দা লস আন্দেস (Cordillera de los Andes)। এই পর্বত-মালা কেপ হর্ন থেকে সুরু হয়ে পানামা যোজক পর্যন্ত প্রায় 4,500 মাইল বিস্তৃত এবং দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের প্রায় সমান্তরাল। উচ্চতম শৃঙ্গ আকোঙ্কাগুয়া (22,814 ফিট) একটি মৃত আগ্নেয়গিরি, আর্জেন্টিনায় অবস্থিত। ইকুয়াডোরের কটোপাক্সি (19,344 ফিট) এখনও জীবন্ত তবে চিম্বোরাজো (20,560) সম্ভবতঃ মৃত।

10. **কনডর**—যোগীন্দ্রনাথ সরকার পশুপক্ষী-তে (শৈব্যা সংস্করণ, পৃঃ 189) লিখেছেন: 'শকুন গোষ্ঠীর যত রকম পাখী আছে তাদের মধ্যে আমেরিকার 'কণ্ডর' (Condor) সর্বাপেক্ষা বড়। ইহারা লম্বে 4 ফুটের কম নহে। ইহাদের ডানার প্রসারও প্রায় 6 হাত।' বৈজ্ঞানিক নাম Sarcorhamphus gryphus নিবাস প্রধানতঃ অ্যাণ্ডিজ পাহাড়ের চূড়ায়। প্রসঙ্গতঃ ক্যালিফোর্ণিয়ার বিশাল শকুনদের নাম ক্যালিফোর্ণিয়া কণ্ডর (Californian Condor)। পক্ষী বিজ্ঞানীরা এদের বলেন Cathartes Californianus।

11. **আর্জেনটাইন**—আর্জেন্টিনার অধিবাসী। আর্জেন্টিনার উত্তরে বলিভিয়া, উত্তর-পূর্বে প্যারাগুয়ে, ব্রাজিল এবং উরুগুয়ে, দক্ষিণ-পূর্বে এবং দক্ষিণে আটলান্টিক মহা-সাগর এবং পশ্চিমে চিলি। দক্ষিণ আমেরিকার এই বৃহত্তম দেশের ভাষা স্প্যানিশ। অধিবাসীদের দেহে স্প্যানিশ, রেড ইণ্ডিয়ান এবং নিগ্রো রক্ত আছে। এখন রাজধানী বুয়েনোস আইরেসের সেখানে স্পেনের ভাগ্যান্বেষীরা জন পেড্রো দে মেন্দোজার নেতৃত্বে একটি দুর্গ তৈরি করে 1535 খৃষ্টাব্দে। দেশের বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম রাউল আলকোন্সিন।

12. **মশা**—Culicidae পরিবারের Diptera শাখার সদস্য। প্রজাতির সংখ্যা প্রায় 2,500। এদের মধ্যে তিনটি সবচেয়ে পরিচিত—অ্যানোফিলিস (ম্যালেরিয়ার জীবাণু বাহক; বাঁচে 18 দিন থেকে কয়েক সপ্তাহ)।

লোকজনের মারফত তিনিই করিয়ে দেবেন। এ অঞ্চল তাঁর একরকম হাতের মুঠোয়। তাঁর লোকজনের হাত এড়িয়ে কারুর পালাবার ক্ষমতা নেই।

কথাটা যে কতখানি সত্য একদিন পার না হতেই বুঝতে পারলাম। পরের দিন সকালেই মিঃ নিশিমারা তাঁর গবেষণাগার আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে অনেক কিছু বুঝিয়ে দিলেন। সাধারণ কীটতত্ত্বের গবেষণা তিনি যে করেন না, তাঁর ল্যাবরেটরির নানা বিভাগ দেখেই তা অবশ্য বোঝা যায়। শুধু পর্যবেক্ষণ নয়, কীটপতঙ্গ লালন-পালন ও পরিবর্ধন করবার জন্য রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক নানা যন্ত্রপাতি ও উপাদান-উপকরণ তাঁর বিরাট ল্যাবরেটরিতে আছে।

মিঃ মার্টিন এক সময়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পোকা-মাকড়ের ভেতর মশা-ই দেখছি আপনার গবেষণার প্রধান বিষয়।'

মিঃ নিশিমারা একটু হেসে বললেন, 'তাতে আশ্চর্য হবার কিছু আছে? মানুষের সভ্যতার মশা-ই হচ্ছে সবচেয়ে বড় শত্রু। এই সাখালীন দ্বীপ থেকে শুরু করে সমস্ত পৃথিবীতে শুধু ম্যালেরিয়ার বাহন হিসাবে মশা কি পরিমাণ ক্ষতি প্রতিনিয়ত করছে, ডাক্তার হিসেবে আপনার নিশ্চয় অজানা নয়।'

মিঃ মার্টিন বললেন,—'কিন্তু আপনার গবেষণাগারে ত দেখছি মশার লালন-পালনই হ'ল আসল কাজ। এর দ্বারা ম্যালেরিয়ার কি প্রতিকার হবে বুঝতে পারছি না।'

নিশিমারা আবার হেসে বললেন, 'না বোঝবারই কথা। শুধু মশা মেরে নয়, মশা যাতে আর ম্যালেরিয়ার বাহন না হতে পারে, সেই চেষ্টা করে আমি ম্যালেরিয়া সমস্যার নতুন ভাবে সমাধান করতে চাই।'

আমাদের একটু অবাক্ হতে দেখে তিনি বললিন,—'মশা কি করে রোগের জীবাণু ছড়ায় আপনাদের নিশ্চয় জানা আছে। তার মুখ একটা ডাক্তারী যন্ত্রের বাক্স বললেই হয়। গায়ের ওপর বসে প্রথম একটি যন্ত্রে সে চামড়া ফুটো করে, তারপর আর একটি যন্ত্রে মুখের লালা সেখানে লাগিয়ে দিয়ে আমাদের রক্ত যাতে চাপ না বেঁধে যায় তার ব্যবস্থা করে। এরপর তৃতীয় যন্ত্র নল দিয়ে সে রক্ত শুষে নেয়।

আমাদের শরীরে যে রোগের জীবাণু ঢোকে, সে তার ওই দ্বিতীয় যন্ত্রের লালা থেকে। মশার জন্মের পর যদি কোন উপায়ে তার লালার এমন রাসায়নিক পরিবর্তন করে দেওয়া যায় যে, বিষাক্ত ম্যালেরিয়ার জীবাণু তার ভেতর বাঁচতেই পারবে না, তাহলে মশা হাজার কামড়ালেও আর

কিউলেক্স (এনসেফেলাইটিস এবং ফাইলেরিয়ার জীবাণু বাহক; বাঁচে 10 থেকে 14 দিন, শীতের দেশে কিছু বেশি) এবং এডেস (পীতজ্বর, ডেঙ্গু এবং এনসেফেলাইটিস-এর জীবাণু বাহক; বাঁচে দশ দিন কিন্তু শীতের দেশে কয়েক মাস)। পুরুষ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্ত্রী মশা গাছের রস খেয়ে বাঁচতে পারে। তবে ডিম পাড়ার পরে স্ত্রী মশার মানুষ বা জীবজন্তুর রক্ত না খেলে চলে না। বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন মশারা গায়ের গন্ধে আকৃষ্ট হয়। ভোঁ ভোঁ আওয়াজটা আসে দ্রুত ডানা নাড়া থেকে। স্ত্রী মশারা ডানা নাড়ে একটু আস্তে, সম্ভবতঃ এই ভাবেই তাদের চেনা যায়। অ্যানোফিলিস ডিম পাড়ে শ্যাওলা ঢাকা জলে। কিউলেক্স-এর প্রিয় যে কোনো জায়গায় জমা জল। এডেস ফুলের টব, টিনের কৌটো এমন কি ফেলে দেয়া গাড়ীর টায়ারও বাদ দেয় না।

13. 19 9 সালের 5ই আগস্ট—এর ঠিক দু' দিন আগে, অর্থাৎ 2রা আগস্ট, মস্কোতে জার্মান রাষ্ট্রদূত শুলেনবের্গ (Schulenberg) রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মলোটভের (Malotov) সঙ্গে দেখা করে তাঁকে জানান জার্মানী সোভিয়েট ইউনিয়নের বন্ধুত্ব চায়। মলোটভ স্পষ্ট উত্তর দেন নি বরঞ্চ বলেন 1937 খ্রীষ্টাব্দের 25শে নভেম্বর স্বাক্ষরিত জার্মানী—জাপান কোমিণ্টান (Comintan) বিরোধী চুক্তি বন্ধুজনোচিত কাজ নয়। হিটলারের আসল উদ্দেশ্য ছিল রুশ সরকারকে শান্ত রাখা যাতে পোল্যাণ্ড অভিযানে তারা বাধা সৃষ্টি না করে। কথাবার্তার পর শুলেনবের্গের ধারণা হয় সোভিয়েট ইউনিয়ন বৃটেন ও ফ্রান্সের দিকে ঝুঁকেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কূটনীতিক ইতিহাসে এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা।

14. সাখালীন দ্বীপ—1945 খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের পর থেকে দক্ষিণ সাখালীন সোশিয়ালিস্ট ফেডেরাল সোভিয়েট রিপাবিক-এর (Russian Socialist Federal Soviet Republic) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর আগে এই অংশটি জাপানের অধীন ছিল (রুশ জাপানের প্রথম যুদ্ধের ওপর টীকা দ্রষ্টব্য)। এই পর্বতময় দ্বীপটির লম্বাটে ধরণের আয়তন 29,400 বর্গ মাইল। শীতকালে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা এবং গ্রীষ্মে দারুণ গরম। শস্যের চাষ এই কাহিনীর সময় হত না বললেই চলে। প্রচুর লোমশ প্রাণী (যাদের থেকে ফার পাওয়া যায়) আর কয়লা ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে অধিবাসীদের প্রায় অর্ধেকেই ছিল কয়েদী।

15. অ্যাম্বার—অ্যাম্বারগ্রিস (Ambergris)-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। ছাই রঙের মোমের মত পদার্থ। গরম

আমাদের ভয় নেই। আমার গবেষণাগারে মশার লালা-পরিবর্তনের চেষ্টাই আমি করছি।'

বিশ্বাস করি না করি, নিশিমারার কথায় প্রতিবাদ কিছু করিনি। সমস্ত গবেষণাগারটা আমাদের কাছে তখনই কেমন রহস্যময় মনে হয়েছে। আগের রাত্রের সেই অমানুষিক চীৎকারের শব্দের কথা তখনও ভুলতে পারিনি। নিশিমারাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি সেটা কোন বন্য জন্তুর আওয়াজ বলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু মনে হয়েছে কিছু যেন তিনি গোপন করে যাচ্ছেন।

সেই গোপন রহস্য যে কি, সেইদিন রাত্রেই টের পেলাম। নিশিমারা আমাদের যত্ন-আতিথ্যের কোন ত্রুটি করেন নি। রাত্রের খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা তখন আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট ঘরটিতে শুতে এসেছি, হঠাৎ মিঃ মার্টিন বললেন, 'এরি মধ্যে শুয়ে কি হবে? আসুন একটু বাইরে ঘুরে আসি।' তাঁর কথায় রাজী হয়ে বাইরে বেরুতে গিয়ে অবাক্ হয়ে গেলাম। আমাদের ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ।

'এর মানে?' মিঃ মার্টিন অত্যন্ত চিন্তিত ভাবে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

মানে ঠিক না বুঝতে পারলেও এই দরজা বন্ধ করার পেছনে যে কোন শয়তানী মতলব আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ তখন আর আমাদের নেই।

কিন্তু এত সহজে আমরা হার মানব কেন? ছাত্রদের কাছে হাওয়া চলাচলের একটা ছোট ভেণ্টিলেটর ছিল। কোনরকমে তারই পাল্লা ভেঙে দুজনে সেখান দিয়ে গলে বাইরে গিয়ে নামলাম।

ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রি। শুধু ল্যাবরেটরির একটা ঘরে তখনো আলো জ্বলছে। সন্তর্পণে সেই ঘরটার পেছনে একটা জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াবার আগেই সেই কালকের রাতের মত রক্ত জল করা আর্তনাদ শুনতে পেলাম। সে আর্তনাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা জানালা বেয়ে ঘরের ভেতর লাফিয়ে পড়েছি। কিন্তু একি ব্যাপার! যার খোঁজে আমরা বেরিয়েছি সেই তানুলিনই মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ে অসীম যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। তার একপাশে কাল রাতে যাকে দেখেছিলাম সেই যমদূতের মত কাফ্রী (19) প্রহরী দাঁড়িয়ে, অন্য পাশে ফাঁপা একটা কাঁচের মোটা নলের জিনিস হাতে করে নিশিমারা।

'ব্যাপার কি মিঃ নিশিমারা?' বেশ একটু উত্তেজিত ভাবেই জিজ্ঞাসা করলাম। মিঃ নিশিমারা আমাদের দেখে রাগে বিস্ময়ে খানিক কথাই বলতে পারলেন না। তারপর অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে বললেন, 'আমার আতিথেয়তার

দেশের সমুদ্রে ভাসতে দেখা যায়। স্পার্ম তিমির পেটেও থাকে। 'ছড়ি'তে ঘনাদা ওলাফ সোরেন সেনের সঙ্গে দক্ষিণ মেরুর কাছে এই জন্যই তিমি খুঁজছিলেন। এখন অ্যাম্বারগ্রিসের ব্যবহার প্রধানতঃ এসেন্সে আতরের কারবারে, আগে হত রান্নায়। শাদা অ্যাম্বার (white amber) হলদেটে 'তৈল স্ফটিক' (fossil resin)। ঘষলে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হয়, যে জন্য এর গ্রীক নাম এলেকট্রন। গহনা তৈরিতে ব্যবহার হয়।

16. **অ্যালেক্জ্যানড্রোভস্ক্**—এই নামে রাশিয়াতে তিনটি শহর আছে। একটি নীপার (Dniper) নদীর কাছে। একটি উত্তর মেরু সাগরের পাড়ে তুষারমুক্ত বন্দর। আর একটি পূর্ব সাইবেরিয়ার বন্দর, সাখালীন দ্বীপের ঠিক উল্টো দিকে। ঘনাদা শেষেরটির কথাই বলছেন।

17. **ভ্লাডিভস্টক**—প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে এশীয় রাশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর শহর। এখানে জারেরা একটি দুর্গও তৈরি করেছিলেন। বিখ্যাত ট্রান্স্-সাইবেরিয়ান রেলপথের একটি শাখা এখানে শেষ হয়েছে। বছরে তিন মাস বন্দরটি বরফের জন্য বন্ধ থাকে।

18. **টিয়ারা**—সাখালীন দ্বীপের উচ্চতম শৃঙ্গ। উচ্চতা 5,000 ফিট।

19. **কাফ্রী**—বাংলা অভিধানে (জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এবং হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় শব্দটি বাদ দিয়েছেন) অর্থ দেওয়া আছে আফ্রিকার লেখক, নিগ্রো। উৎপত্তি পর্তুগীজ Caffre থেকে। অক্সফোর্ড ডিকশনারীতে দেখছি এর অন্যতম অর্থ দক্ষিণ আফ্রিকার বাণ্টু জাতির কালো মানুষ। মূল বাসস্থানের ল্যাটিন নাম Caffraria।

20. **যুযুৎসু**—মূল জাপানী শব্দ যুজিৎসু (Jujitsu) যার ইংরেজি অনুবাদ Soft Art। খালি হাতে আত্মরক্ষার এক বিশেষ পদ্ধতি। ঘনাদা কি উপায়ে শত্রুদের বশ করেন তার বিশদ বর্ণনা দিতে বোধ হয় লজ্জা পান। সাধারণতঃ জামাটি একটু ঝেড়ে নিয়েই ('ছুড়ি' দ্রষ্টব্য) তিনি চেয়ে দেখেন প্রতিপক্ষ সচাপ্টে যেমনভাবে পড়েছিল সেইভাবেই শুয়ে আছে। ঐ একই কাহিনীতে তিনি ছুরি ছুড়ে এক বন্দুকধারীর ডানহাতের জামার আস্তিন দেয়ালের সঙ্গে এঁটে দেন যাতে তার হাত নাড়ার ক্ষমতা না থাকে। 'কাচ' থেকে শিবুর জবানীতে জানা যায় ব্যাটলিং মিকিকে তিনি স্ট্রেট লেফটে নাজেহাল করেছিলেন। 'ঢিল'-এ কালো লোহার তৈরি একটা বিরাট দৈত্য প্রথম জাহাজের ডেকের ওপর মুখ থুবড়ে পড়েছিল। তারপর তাকে তুলতে হল কেবিনের ভেতর থেকে।

(শেষাংশ 61 পৃষ্ঠায়)

বিজ্ঞানী ঘনাদা   ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য

ঘ-না-দা !

ছোটদের কাছে একটা দারুণ নাম—যাঁর চলনে বলনে ছড়িয়ে আছে মজা—মজা—আর মজা ! শুধু ছোটরা কেন, আমরা, বড়রাও কি তার রস থেকে বঞ্চিত ? নিশ্চয়ই নয়।

কিন্তু শুধুই কি মজা ? না, ভালো করে পড়লে দেখা যাবে ঐ বিচিত্র চরিত্রটির মধ্যে এমন কতকগুলি জিনিস ছড়িয়ে আছে যা পড়ার পর মজা হয়তো ঠিকই পাওয়া যায় কিন্তু সেই সঙ্গে মনকেও বেশ একটু ভাবিয়ে তোলে।

72 নম্বর বনমালী নস্কর লেনের অর্থাৎ সেই সরু গলির মধ্যেকার মেস বাড়িটার ঠিকানাটাও আমাদের মুখস্থ হয়ে গেছে– যেখানে ওপরের টঙের ঘরে ঘনাদা আস্তানা গেড়েছেন আর আসর জমিয়ে তুলেছেন দোতলার আড্ডার ঘরে। এমনও শোনা গেছে, কোনও কোনও উৎসাহী পাঠক নাকি উত্তর কলকাতার ঐ রাস্তাটি খুঁজে খুঁজে হয়রানও হয়েছে—72 নম্বরের বাড়ি খুঁজে পাওয়া তো দূরের কথা। কিন্তু পাবে কি করে ? ঐ বনমালী নস্কর লেন নামটার অস্তিত্ব যে শুধু লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রের মাথার ভিতর তা তো তারা জানে না !

বিখ্যাত ইংরেজ লেখক স্যার আর্থার কন্যান ডয়েলের গল্পের অপূর্ব চরিত্র শার্লক হোমসের বাড়ি নিয়েও নাকি অনেকবার ঠিক এই রকম ঘটনা ঘটেছে। লণ্ডনের বেকার স্ট্রীটের 21 নং বাড়িটা ছিল গল্পের শার্লক হোমসের ঠিকানা। গল্প পড়ে মনেও হ'ত না যে শার্লক হোমস্ একটি কাল্পনিক চরিত্র এবং তাঁর ঠিকানাটাও কাল্পনিক। তবু গল্প পড়ে কেউ কেউ হন্যে হয়ে ছুটত ঐ ঠিকানার খোঁজে–যদি শার্লক হোমস্‌কে চাক্ষুষ দেখার সুযোগ পাওয়া যায়।

রচনার মধ্যে কতখানি মুন্সীয়ানা থাকলে তবেই এরকম ব্যাপার সম্ভব হতে পারে ভাবলে অবাক্ লাগে। ঠিক এই রকম অসম্ভব মুন্সীয়ানার পরিচয় আমরা পেয়েছি প্রেমেন্দ্র মিত্রের "ঘনাদা" চরিত্রের কল্পনার মধ্যে।

হ্যাঁ, ঘনাদা সত্যিই একটি বিচিত্র চরিত্র। এখানে একটা "অসাধু" ভাষা ব্যবহার করতে ইচ্ছে হচ্ছে। অসাধু হলেও কথাটা বড়ই অর্থবহ। কী কথা ? বলেই ফেলি তা হলে। "গুল মারা"। এই ঘনাদা গুল মারতে দারুণ ওস্তাদ্। এমন সহজ ভাবে এমন অসম্ভব অসম্ভব গল্প তিনি বলে যান যা আদপেই যে সত্যি নয়,—সমস্তটাই তথাকথিত 'গুল',—একথা শ্রোতারাও বোঝে এবং তা সত্ত্বেও তাঁকে ছাড়তে চায় না। ঘনাদা খেতে ভালোবাসেন তাই তাঁর জন্য মেসের বাসিন্দারাই যোগাড় করে আনে নানা রসনা-মুগ্ধকর সুখাদ্য, খায় দামী দামী সিগারেটও। আর তারই আড়ালে বসে চলে ঘনাদার রাজা-উজীর-মারা গল্প। সত্যি না হলেও সে গল্পের রস এতই চিত্তাকর্ষক যে সেজন্য কেউ কিছু মনে করে না, ঘনাদাকে পারতপক্ষে চটাবার চেষ্টাও করে না কেউ—বিশেষ করে মেসের বাসিন্দা শিশির, শিবু, গৌর আর স্বয়ং 'আমি' তো বটেই।

পুরো নাম ঘনশ্যাম দাস। কিন্তু সে নাম কেউ ব্যবহার করে না, ঘনাদা নামটাই চালু হয়ে গেছে। রোগা, লম্বা, শুকনো হাড়-বার-করা চেহারা। বয়স ? তা 35ও হতে পারে 55ও হতে পারে। অবশ্য দিনে দিনে প্রকৃতির নিয়মে নিশ্চয়ই বেড়ে চলেছে, কিন্তু ঘনাদার ওপর তার কোনও ছাপ পড়েছে বলে মনে হয় না।

এই ঘনাদার কথাবার্তা শুনলে মনে হবে, এবং আমরাও তা মেনে নিয়েছি, যে গত 200 বছর ধরে পৃথিবীতে হেন জায়গা নেই যেখানে তিনি যান নি, হেন বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটেনি যার সঙ্গে তাঁর কোন-না-কোন রকম ভাবে যোগ নেই। ভূগোলকে তো তিনি প্রায় গুলে খেয়েছেন।

ভূগোলকে যদি আমরা বিজ্ঞানের একটা বিভাগ বলে ধরি তা হলে এদিক দিয়েও হয়তো ঘনাদা একজন মস্ত বড় বিজ্ঞানী।

আফ্রিকার সেই দুর্ভেদ্য জঙ্গল, যেখানে দিনের বেলাও এক ফোঁটা সূর্যের আলো ঢুকবার সাহস পায় না, নদী-জলা সব কুমীর আর হিপোপটেমাস্ দিয়ে ঠাসা, ঘাসবনের ভিতর দিয়ে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে দলে দলে সিংহ আর সিংহী ঘুরে বেড়াচ্ছে, বনস্পতির আড়াল দিয়ে দলবদ্ধ হয়ে চলেছে হাতির পাল, গোঁয়ারগোবিন্দ গণ্ডার আর বুনো মোষ ছুটে চলেছে তীরবেগে, হরিণ, জেব্রা, জিরাফ ভয়ে দৌড়চ্ছে—সর্বত্রই ঘনাদার অবাধ গতি। পড়েছেন বুনো জংলী মানুষদের খপ্পরে, আবার নিজেও হানা দিয়েছেন কিভু উপত্যকায় পাহাড়ী গরিলার ডেরায়। শিকারে তাঁর জুড়ি নেই, যখন বন্দুক ধরেন তখন অব্যর্থ হাতের নিশানা। তার ওপর আছে তাঁর যুযুৎসু বা ক্যারাটের প্যাঁচ—অতি বড় পালোয়ানও যার খপ্পরে একবার পড়লে আর নড়েচড়ে উঠে দাঁড়াতে পারে না।

শুধু কি জঙ্গলে? জলের ওপরে, সমুদ্রের তলায়, অস্ট্রেলিয়ার মরুপ্রান্তরে, আল্প্স্-এর তুষার ধবল চূড়ায়—মায় উত্তর আর দক্ষিণ-মেরুর কন্‌কনে শীতে কত দিন কত রাত কাটিয়েছেন তিনি! হ্যাঁ, এই আমাদের ঘনাদা।

বিজ্ঞানকে নিয়েও ঘনাদা কম মোচড় দেন নি। তা হলে কি তিনি একজন বিজ্ঞানী? তা—তা,—হ্যাঁ বিজ্ঞানীও বটেন বৈকি! নিজের হাতে বিজ্ঞানের গবেষণা না করলেও নানা বিজ্ঞানীর সংস্পর্শে এসে তিনি যে সব তথ্য পরিবেশন করেন তা কিন্তু সত্যি অস্বাভাবিক মনে হলেও মোটামুটি বিজ্ঞান-নির্ভর—বিজ্ঞানের প্রাথমিক সূত্র বা নিয়মকে মেনে নিয়েই তা রচিত। আর খুঁটি-নাটি সেই তথ্যগুলি এত নিখুঁত যে মনেই হয় না এ কোনও বিজ্ঞানীর নিজস্ব গবেষণালব্ধ ফল নয়। এ ব্যাপারে ঘনাদাকে অনন্য বলা যেতে পারে এবং এ জন্যই তাঁর "গুল-দেওয়া-কাহিনী-গুলোর" মধ্যেও কেমন একটা অনাস্বাদিত আনন্দ পাওয়া যায়। পড়ে ভাবতে হয় এবং ভেবে মনে হয়, আচ্ছা, এ-রকমটা তো সত্যিই অসম্ভব নয়! হতে পারে না কি? আবার সঙ্গে সঙ্গেই সন্দেহ জাগে বাস্তবে কখনও এ জিনিস ঘটতে পারে?

ঘনাদার গল্প এক-একটা এক এক স্বাদের—যদিও ঘনাদার চাল মারার পরিচয় বহন করে আছে সব ক'টিই। লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র এমনভাবে চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন যে তার প্রত্যেকটা চালচলনে যেমন মজা লাগে তেমনি মাঝে মাঝে ভাবায়ও। লেখকের নিজের ভিতর যে একটা বিজ্ঞান-মানসিকতা আছে সেটাই এ সব গল্পে ধরা পড়ে এবং লেখকের প্রতি অলক্ষ্যে একটা শ্রদ্ধাও জেগে ওঠে আমাদের মনে। প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রথম জীবনে বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও নিজে বিজ্ঞানী ন'ন। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর কৌতূহল অদম্য আর তারই ছায়া এসে পড়েছে এইসব গল্পে।

ঘনাদা নিজেও, আগেই বলেছি, ঠিক যে অর্থে আমরা বিজ্ঞানী বলি সে অর্থে বিজ্ঞানী ন'ন। কিন্তু তাঁরও একটা বিজ্ঞান মানসিকতা আছে যা ছড়িয়ে আছে তাঁকে নিয়ে লেখা অজস্র গল্পের মধ্যে।

কয়েকটা উদাহরণ দিলে হয়তো ব্যাপারটা আর একটু স্পষ্ট হবে।

মশার লালাকে রাসায়নিক পরিবর্তন করে সাপের বিষের মত ভয়ঙ্কর করা যায় কি? এ ধরনের কিছু কিছু পরিবর্তন এ যুগের বায়োকেমিস্টরা করবার চেষ্টা করেছেন এবং সে চেষ্টা সাফল্যের দিকেই এগিয়ে চলেছে। ঘনাদার গল্পে দেখেছি জাপানী বিজ্ঞানী নিশিমারাও এ রকম একটা চেষ্টা করেছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন—যদিও উদ্দেশ্য ছিল তাঁর অত্যন্ত অসৎ এবং পৃথিবীর পক্ষে বিপজ্জনক তো বটেই। ঘনাদা তাঁর বিজ্ঞানমানসিকতার সাহায্যে ঐ উদ্দেশ্য ধরে ফেলেন, তারপর ঐ মশা দিয়েই নিশিমারারও ভবলীলা শেষ করে দেন। সে এক রোমাঞ্চকর কাহিনী।

ইহুদী কীটতত্ত্ববিদ্ জ্যাকবের কাহিনীও এইরকম আর একটি রোমাঞ্চকর কাহিনী।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ও ঐ সময়ে নাৎসী জার্মান্ অর্থাৎ প্রাশিয়ানরা ইহুদীদের ওপর যে জঘন্য অত্যাচার করে চলেছিল তারই প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর। তিনি ঠিক করলেন সি. সি বা সিস্টোসাকা গ্রিগেরিয়া নামে পঙ্গপাল জাতীয় একটি পতঙ্গের সাহায্যে ধ্বংস করে দেবেন সারা ইয়োরোপের শস্যভাণ্ডার। একমাত্র আফ্রিকাতেই এক বিশেষ অঞ্চলে এই জাতের পতঙ্গ দেখতে পাওয়া যায়। জ্যাকব সেইখানে গিয়ে এই পতঙ্গের বংশ বৃদ্ধি করিয়ে তাদের সংখ্যা বিপুলভাবে বাড়াবার জন্য তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু করলেন। কীটতত্ত্ববিদ্‌দের কাছে কিন্তু ব্যাপারটা নতুন নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে যে পঙ্গপালের সৃষ্টি হ'ল তা অভূতপূর্ব। জ্যাকব মতলব করেছিলেন তিনি ইটালি থেকে তাঁর এই পঙ্গপালের আক্রমণ শুরু করবেন। কথাটা তিনি তাঁর ভাই আইজ্যাককে বললেন। আইজ্যাক ইহুদী হলেও প্রাশিয়ান সেজে নাৎসীদের আস্থাভাজন হয়েছিলেন—নাম নিয়েছিলেন ভরনভ্। দু'জনে অনেকদিন ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হয়ে গেল ট্রেনে। জ্যাকব চাইলেন ভরনভ্ ওরফে আইজ্যাক ইহুদী নির্যাতনের প্রতিশোধ গ্রহণে তাঁর সঙ্গী হোন। আইজ্যাক তখনকার মত রাজী হলেও শেষ পর্যন্ত ঐ নিদারুণ বিপর্যয়ে সারা ইয়োরোপকে জড়াতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি উল্টে ঐ পঙ্গপাল ধ্বংস করার জন্য গোপনে আবিষ্কার করলেন

একরকম রোগবীজাণু যা একটি পঙ্গপালের দেহে কোন রকমে বিঁধিয়ে দিতে পারলে সে নিজে তো রোগাক্রান্ত হবেই সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পঙ্গপালের দলে ছড়িয়ে পড়বে সে রোগ মহামারী আকারে। নিজেকে গোপন রেখে তিনি একাজে তাঁর প্রতিনিধি ঠিক করলেন ঘনাদাকে এবং ঘনাদা কি কৌশলে একটি মাত্র পঙ্গপালকে ধরে তার ওপর এই ওষুধ প্রয়োগ করে গোটা ইয়োরোপকে শস্যহীন, দুর্ভিক্ষপীড়িত হবার বিপদ থেকে মুক্ত করলেন সে আর এক কাহিনী। নিজে আবিষ্কার না করলেও তার প্রয়োগ কৌশলে ঘনাদার কৃতিত্ব এই গল্পের একটা বড় উপাদান।

এমনি ধারা ভয়ঙ্কর এক আগাছার চাষ করে জমির সমস্ত ফসলকে বিষিয়ে দিয়ে দেশকে দেশ শস্যহীন মরুভূমি করে দেওয়ার প্রচেষ্টা—তারও গল্প শুনতে পাই ঘনাদার কাছেই।

চাষীর ক্ষেতে আগাছার উপদ্রব এখন প্রায় নির্মূল করা সম্ভব হলেও অনেকেই জানে না যে এমন অনেক আগাছা আছে যাদের বীজ মাটির তলায় 30/40 বছর ঘুমিয়ে থাকতে পারে, তার পর একদিন আলোয় বেরিয়ে এসে তারা শুরু করে দেয় তাদের বিষক্রিয়া। এমনি ধরনের কয়েকটা আগাছার চলতিনাম 'ব্ল্যাক্ মাস্টার', 'ইভনিং প্রিমরোজ।' এইরকম আগাছার সাহায্যে সারা দেশের কৃষিব্যবস্থা বানচাল করার চেষ্টাকে কি করে ঘনাদা প্রতিহত করলেন সে গল্পও শুনতে মন্দ নয়। আর এর যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে তাও অস্বীকার করার উপায় নেই।

এমনি আরও কত গল্প !

সমুদ্রের বুকে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়। আসলে সেটা একটা নিবন্ত আগ্নেয়গিরি। আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ বন্ধ হয়ে গেছে। বৃষ্টির জল জমে জমে সেই পাহাড়ের ওপর তৈরি হয়ে গেছে এক বিশাল হ্রদ। হ্রদের নিচে যে ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি রয়ে গেছে তা কেউ জানে না। কিন্তু ঐ জলের মধ্যে যে হীরে ছড়ানো আছে সে খবর রাখত ঘনাদার ফরাসী বন্ধু পেত্রা। ঐ পেত্রার সঙ্গে ডুবুরীর পোশাক পরে জলে নামলেন ঘনাদা, তার পর একটা হীরে, যাকে দেখে ছোট একটা নীলচে কিন্তু জ্বলজ্বলে নুড়ি বললেও ভুল হয় না, শাবল দিয়ে খুঁচিয়ে আলগা করে নিয়ে তুলে ফেললেন। দেখা গেল ওর তলায় একটা নলের মত গর্ত রয়েছে আর নুড়ি তুলতেই তাই দিয়ে হুড় হুড় করে জল নেমে যাচ্ছে পাতালের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে পেত্রা পাগলের মত ঘনাদার হাত ধরে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে এল হ্রদের এক কোণে, তারপর তরতর করে দড়ি বেঁধে নেমে গেল নীচে সমুদ্রের বুকে যেখানে একটা মোটর বোট আগেই লুকিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল। বোটে উঠেই জোরে ছুটিয়ে দিল সেটা। আর, খানিক পরেই শুরু হল প্রলয় কাণ্ড। হাজার বজ্রের মত শব্দ করে গোটা পাহাড়টাই ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

এর সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন লেখক। আপাতদৃষ্টিতে আজগুবি মনে হলেও ভূতত্ত্বের দিক্ দিয়ে ব্যাপারটা মোটেই অসম্ভব নয়। আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ বন্ধ হয়ে গেলেও আনেক গভীরে তার আগুন নাও নিবতে পারে—ধিকি ধিকি করে জ্বলছে তো জ্বলছেই। এখন, জ্বালামুখ বন্ধ হয়ে গেলেও একটা ছোট্ট গর্ত রয়ে গিয়েছিল তার গায়ে আর সেই গর্তের ওপর হীরেটা খুব চেপে বসে থাকায় সে গর্ত বন্ধ হয়েই ছিল। হীরের নুড়িটা খুবলে তুলে নিতেই সেই ছোট্ট গর্তের মুখটা গেল খুলে আর সেই গর্তের ভিতর দিয়ে ওপরকার জল তোড়ে গিয়ে পড়তে লাগল একেবারে তলাকার আধ-ঘুমন্ত আগুনে পাহাড়ের সেইখানটায় যেখানে ধিকি ধিকি করে জ্বলছিল আগুন—যার প্রচণ্ড উত্তাপের কথা ভাবা যায় না। ফলে চোঁয়ানো জল সেই প্রচণ্ড তাপে সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পীভূত হয়ে আবার ঠেলে উঠতে লাগল ওপরে—সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি করল প্রচণ্ড চাপের। বাষ্প ক্রমাগত তৈরি হচ্ছে তো হচ্ছেই, তার চাপও ক্রমাগত বেড়ে চলছে তো চলছেই। আর ওপরে তো বেরিয়ে যাবার পথ ঐ সবেধন একটি গর্ত! সেখান দিয়ে আর কতটা বাষ্প বেরিয়ে যেতে পারে? তার আশ-পাশে রয়েছে শিলাখণ্ড, কিন্তু তার সাধ্য ছিল না সে চাপ সহ্য করার। ফলে গোটা পাহাড়টাই ফেটে চৌচির করে দিল সেই প্রচণ্ড বাষ্পের চাপ। তার জন্য শব্দ তো হবেই।

গল্পের খাতিরে ব্যাপারটা হয়তো একটু ফাঁপিয়েই লেখা হয়ে থাকবে কিন্তু বিজ্ঞানের দিক্ দিয়ে দেখলে ব্যাপারটা মোটেই অসম্ভব নয়। ভিতরকার রহস্যটা অবশ্য ঘনাদা নিজে উদ্ধার করেন নি, কিন্তু পেত্রার ব্যাখ্যা তিনি ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন তাঁর বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে।

কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে কি ঘনাদা কখনও বিজ্ঞানীর ভূমিকা নেন নি? হ্যাঁ, তাও নিয়েছেন।

ইউরেনিয়াম একটি তেজস্ক্রিয় মৌল এবং এটি পাওয়া যায় পিচব্লেণ্ড নামক মিনারেল বা খনিজ থেকে। মাদাম কুরি তাঁর প্রথম তেজস্ক্রিয় মৌল ইউরেনিয়াম, তার পর পোলোনিয়াম এবং শেষে রেডিয়ামও আবিষ্কার করেছিলেন এই পিচ্ ব্লেণ্ডেরই পরিত্যক্ত ছিবড়ে থেকে। বিজ্ঞান-সচেতন ঘনাদা এখবর ভালো করেই রাখেন এবং কি করে এই তেজস্ক্রিয়তার হদিস পাওয়া যায়, কি করে সেই তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ মাপা যায় সেই যন্ত্র গেপার বা গাইনার মুলার কাউণ্টার এর সঙ্গেও বেশ পরিচিত। তাই নাৎসী জার্মেনীর হয়ে প্যাপেন আর তার সঙ্গীরা যখন ইউরেনিয়ামের খোঁজে বিছে উপত্যকায় এসে পাহাড়ের ওপর ঘনাদাকে ঐ যন্ত্র সম্মুখে রেখে ম্যাপ আঁকতে দেখে

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল তখন ঘনাদার পক্ষে তাদের মতলব আঁচ করতে কষ্ট হ'ল না। জার্মেনী তখন অ্যাটম্ বোমা বানাবার চেষ্টা করছে। তার জন্য তার দরকার প্রচুর ইউরেনিয়াম জাতীয় তেজস্ক্রিয় মৌল। ঘনাদা সঙ্গে সঙ্গে মনস্থির করে ফেললেন। তিনি ওদের বাধা দেবেন।

কিন্তু ওদিকে আফ্রিকান সর্দারের ভুল বোঝাবুঝির ফলে যখন জংলীদের হাতে প্রাণ হারাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, কুলিরা প্যাপেনকে পিছমোড়া করে বেঁধে তার জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়েছে, আর প্যাপেনের সঙ্গীরা প্যাপেনের সঙ্গে কথা কাটাকাটির পর তার যন্ত্রপাতি কেড়ে নিয়ে নিজেরাই চলে গেছে ইউরেনিয়ামের সন্ধানে, তখন ঘনাদা যে কাণ্ডটা করলেন তা শুনতে সামান্য হলেও অভাবিতপূর্ব। এক ঢিলে দুই পাখি মারবেন তিনি। প্যাপেনের যে সঙ্গীরা যন্ত্রপাতি নিয়ে ইউরেনিয়ামের সন্ধানে বেরিয়ে গেছে তারা ইউরেনিয়াম খনির সন্ধান নিশ্চয়ই জেনে ফেলবে আর কি পরিমাণ ইউরেনিয়াম ওখানে আছে তারও আভাস ঘনাদা ইতিমধ্যেই জানতে পেরে গেছেন। তাদের বাধা দিতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরকেও মুক্ত করতে হবে।

বিহে উপত্যকাটা শুকনো ঘাসের জঙ্গলে ঢাকা আর সারাদিন সেখানে উত্তর-পূর্ব থেকে একটা ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যায়। সেই ঘাসবনে কোন রকমে আগুন ধরিয়ে দিতে পারলেই কার্যসিদ্ধি হতে পারে। তার জন্য চাই একটা দিয়াশলাই।

কিন্তু না, দিয়াশলাই নেই। প্যাপেনের কাছে যেটা ছিল তার শেষ কাঠিটাও সে চুরুট জ্বালিয়ে শেষ করে দিয়েছে।

এখন কি করা? হঠাৎ ঘনাদার বিজ্ঞানী মনে ভেসে উঠল সেই লেন্সের কথা। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল তাঁর দূরবীনের একটা লেন্স্ আচমকা খুলে পড়ে গিয়েছিল, তিনি সেটা পকেটেই পুরে রেখেছিলেন। তবে আর ভাবনা কি? চকিতে লেন্স বার করে নিয়ে তার ওপর সূর্যের আলো ফোকাস্ করে ঘাসবনের দিকে ধরলেন ঘনাদা। পরমুহূর্তেই দপ্ করে জ্বলে উঠল আগুন সামনের একটা ঘাসের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ায় দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল ঘাসবন,—না, যেন সমস্ত ঘাসবনটাই জ্বলন্ত রূপ নিয়ে সহস্র সাপের ফণা দুলিয়ে ছুটে চলল হাওয়ার সঙ্গে দিগ্বিদিকে।

যে জংলীরা আসছিল আক্রমণ করতে তারা প্রাণভয়ে কে কোথায় পালাল তার ঠিক নেই আর ইউরেনিয়াম-সন্ধানী নাৎসীদেরও আর ইউরেনিয়াম খনি উদ্ধার করা সম্ভব হ'ল না।

এছাড়া আরও কত রকম গল্প! তুষার রাজ্যে তুষার-মানব ইয়েতির সঙ্গে মোলাকাৎ, তিমি-ধরা জাহাজে করে মেরু-অঞ্চলে গিয়ে মোম-তিমি শিকার, সেখানে পেঙ্গুইন পাখিদের হালচাল পরিদর্শন তার পর গিরিগহ্বরে আটকা পড়ে ছড়ির সাহায্যে জমে থাকা গরম গ্যাস বার করে নিয়ে পোর্টেবল তাঁবু দিয়ে বেলুন বানিয়ে সেই হালকা গরম গ্যাস বেলুনে পুরে বেলুনের সাহায্যে উড়ে গিয়ে উদ্ধার পাওয়া—এই রকম কত কি! কিছুটা আজগুবি মনে হলেও এগুলি সবই ঘনাদার বিজ্ঞান-মানসিকতার সাক্ষ্য বহন করছে। এমন কি বাইরের অজানা গ্রহ থেকে আসা উড়ন্ত চাকীর কাহিনীও বাদ যায় নি।

শিল্পী নারায়ণ দেবনাথের চোখে ঘনাদা

দ্বিতীয়বারের মহাকাশ যাত্রায় ঘনাদার সঙ্গী বাঁদিকে বটুক ও ডান দিকে সুরঞ্জন। মাঝখানে ঘনাদা। আর সিঁড়ির উপরে উন্মাদ বৈজ্ঞানিক লুটভিক। যেবার ঘনাদা মঙ্গলগ্রহে পেঁছে আবার নিরাপদে পৃথিবীর বুকে ফিরেও এসেছিলেন কাঠপোড়া ছাইয়ের কল্যাণে।

* * * *

তাই বলছিলাম, ঘনাদা বিজ্ঞানী না হয়েও বিজ্ঞানী, নিজের হাতে আবিষ্কার না করেও আবিষ্কারের সবজান্তা। তাঁর সমস্ত গল্পই কল্পিত, কিন্তু তার ভিতরকার বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি অস্বীকার করব কি করে?

16, টাউন সেণ্ড রোড, কলিকাতা-700025

রহস্যের কোন মীমাংসা করা গেল না। ঠিক হোল - মাসখানেক বাদে বিক্রীর দলিল রেজেস্ট্রি করা হবে। এরপর আমি এলাম নিউপোর্টে, ম্যাকের বাড়ীতে।
ম্যাক, আমায় কিছু টাকা ধার দিতে পারো? লাখ দেড়েক ডলার।
এতো টাকা পাবো কোথায়?
বেশ, আমায় একটা ওকালতনামা দাও। তোমার পক্ষে লাখ দেড়েক ডলার নেবার।
বেশ, তা দিচ্ছি।
কথা রইলো - দলিল লেখা হবে কমাদ্বীপের আস্তানায়। আমি ফিরে আসারপর। এরপর প্রায় মাসখানেক আমাকে ঘোরাঘুরি করতে হোল প্রচুর। তারপর ফিরে এলাম নিউপোর্টে। সেখান থেকে কমায়--
আমাদের স্টিমার যখন কমাদ্বীপের কাছে পৌঁছলো---
একি! ওই স্টিমার দুটো কাদের? এখানে কেন?
কার হুকুমে এখানে এসেছে?
ধরুন, আমার। একটা এসেছে ফেনা ছড়াতে, আর একটা মাটি খুঁড়তে।
তার মানে?
ঐ ফেনা ছড়িয়েই এই জোড়া দ্বীপের অপদেবতাকে তাড়ানো হয়েছে। এখানকার সমুদ্রে আবার মাছের গুঁতোগুঁতি শুরু হয়েগেছে। তবে অপদেবতাকে বিদায় করতে একটু খরচও হয়েছে।
ফেনা ছড়ানোর খরচ পড়েছে প্রায় দেড় লাখ ডলার।
এতো টাকা আমি শোধ দেব কী করে?
শোধ দিতে হবে না। তোমার এই জোড়া দ্বীপে মাটি খোঁড়ার ইজারা যারা নিচ্ছে - তারাই ও দেনা চুকিয়ে আরও লাখ দুয়েক ডলার তোমাকে দেবে ম্যাক।
ওটা বায়না।
5

কী বলছো তুমি?
হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি। শোন ম্যাক, তোমার এই জোড়া দ্বীপের ভেতরকার মাটি সব পি ডি 46, আর 106·7। কিছু ও এস 76, আর 190·2-3 আছে।
সেই রাত্রেই একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেল। এবারও আমি একা ছিলাম ড্যাশে। রাত তখন প্রায় দু'টো। বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল।
গৌতম কর্মকার
আসুন, আসুন মিঃ ডুগান, আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।
আমার জন্যে! কেন বলুন তো?
বাহ, আপনার বন্ধুকে বাঁচিয়ে দেবার জন্যে আমায় ধন্যবাদ দিতে আসবেন না? তবে ভেবেছিলাম-আপনি সাঁতরেই আসবেন?
যেমন সে রাত্রে আপনি গিয়েছিলেন?
ঠিক। এসব কাজ চুপিচুপি সারাই ভালো নয় কি! দেখেছেন তো-চুপিচুপি আপনার ঘরে ঢুকে নোটবই খুলে ওসব যে কখন লিখেছি, আপনি জানতেও পারেননি। অথচ আপনি এলেন মোটরবোটে, কাজেই টের পেয়ে গেলাম।
টের পেলেই বা কী করবি? কেলে উচ্চিংড়ে কোথাকার!
আজই তোর শেষ। এখনি তোর লাশটা বোটে বেঁধে ওটা ভাসিয়ে দেবো সমুদ্রের জলে। ও পি ডি 46 আমার আবিষ্কার। আমিই ওর মালিক।
খুব হয়েছে, গলাটা এবার ছাড়ুন।
আর দেখুন, আপনার মালিকানা কদ্দূর গড়ায়!

ওইভাবেই থাকুন। এ গলা টিপে কিছু করা যায় না, বুঝেছেন? যোগব্যায়ামের ফল। এখন আসল কথাগুলো শুনুন।
আঁইইই....
উঃ....
বছর পাঁচেক আগে আপনি এখানে এসেছিলেন। আপনার গ্লিসেরাইডস-এর কারখানা আছে। এখানকার মাটিতে যে অঢেল পি ডি অর্থাৎ প্যালেডিয়াম আছে, তা জানতে পারেন আপনি। নমুনা পরীক্ষা করিয়ে জানতে পারেন -অসমিয়ম অর্থাৎ ও এস-ও আছে। প্যালেডিয়াম-এর অ্যাটমিক নম্বর 46, অ্যাটমিক ওজন 106·7, অসমিয়মের অ্যাটমিক নম্বর 76, ওজন 190·8।
গ্লিসেরাইডস-তৈরীর কাজে প্যালেডিয়াম-এর চেয়ে সেরা ক্যাটালিস্ট আর নেই। অত্যন্ত দামী বলে এ ধাতুর বদলে আপনারা নিকেল ব্যবহার করেন। প্যালেডিয়াম এখানে অঢেল দেখে আপনি দ্বীপদুটো হাতাবার এক অদ্ভুত ফন্দী বার করেন। উত্তর বিষুব স্রোত এই দ্বীপদুটোর প্রায় মাথার কাছ দিয়ে ঘুরে যায়। আপনি সস্তা পেট্রোলের গাদ কিনে দ্বীপের পূবের দিকে কোথাও ঢালার ব্যবস্থা রেখেছেন। সে তেল সমুদ্রের জলের উপর নোংরা সরের মতো ভেসে এসে এই দ্বীপদুটিকে ঘিরে জমতে শুরু করেছে। সরের তলায় সমুদ্রের আণুবীক্ষণিক জীব প্ল্যাঙ্কটন বাঁচতে পারেনি অক্সিজেনের অভাবে।
প্ল্যাঙ্কটন যাদের আহার সেই ছোট মাছ, পোকা, সব মারা গেছে তারপর। ধাপে ধাপে এই মৃত্যুর ঢেউ বিরাট সব জলচরদের স্তর পর্যন্ত পৌঁছেচে। খাবারের অভাবে মাছ আর পাখীরা দ্বীপদুটোকে ভুলেছে।
কিন্তু একো শয়তানী প্যাঁচ সব এক ফেনাই ভেস্তে দিলে।
কী ফেনা?
7

বেপরোয়া জাহাজ চালিয়ে আর কল-কারখানার নোংরা কেংরানি নির্বিচারে ঢেলে সমুদ্রটাকে ডাস্টবিন করে তোলা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা তাই সমুদ্রকে নির্মল করবার জন্যে যে সব উপায় বের করেছেন, তার একটি হোল ঐ ফেনা। ও ফেনাকে কুচানো পলিউরেথেন বলতে পারেন।
বিলেতের একটি কোম্পানী ওটি আবিষ্কার করেছে। তেলের উপর ছড়ালে তেল শুষে নিয়ে ওই ফেনা কালো হয়ে যায়। তখন অনায়াসে ওটাকে জলের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে কোথাও জমা করা হয়। ওটাকে নিংড়ে নিয়ে আবার তেল বের করে নেওয়াও শক্ত নয়।
আমার লাশটা আপনি বোটে ভাসাবেন, ঠিক করেছিলেন। আমি কিন্তু তা করবো না।
এখান থেকে সোজা চলে যান সেন্ট টমাস দ্বীপ। সেখান থেকে আমেরিকা। খবরদার, ম্যাকের ছায়াও আর মাড়াবেন না। আপনি বোটটা নিয়ে যান। আমি সাঁতরেই কমা দ্বীপে ফিরে যাবো।
টঙের ঘরে ফিরে গেলেন ঘনাদা। আমরা অবাক। এভাবে যে আমাদের মাপ করে দেবেন, কে জানতো?
এমন সময় বনোয়ারী এসে হাজির।
কীরে, তপসে মাছ পাসনি?
পাইয়েছে না কী রকম?
হামি গিয়েছে আর মাছ মিলবে নাই? আমি বাস-সে নামলাম। আর বড়বাবু উধান দিয়ে যেতে যেতে হামাকে দেখলে। তারপর আমার মছলি সব ভালো করে দেখে তারিফ করলে।
বড়বাবু—মানে ঘনাদা। তেলের গল্প আর তপসে মাছের মধ্যে কোন নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে নাকি?

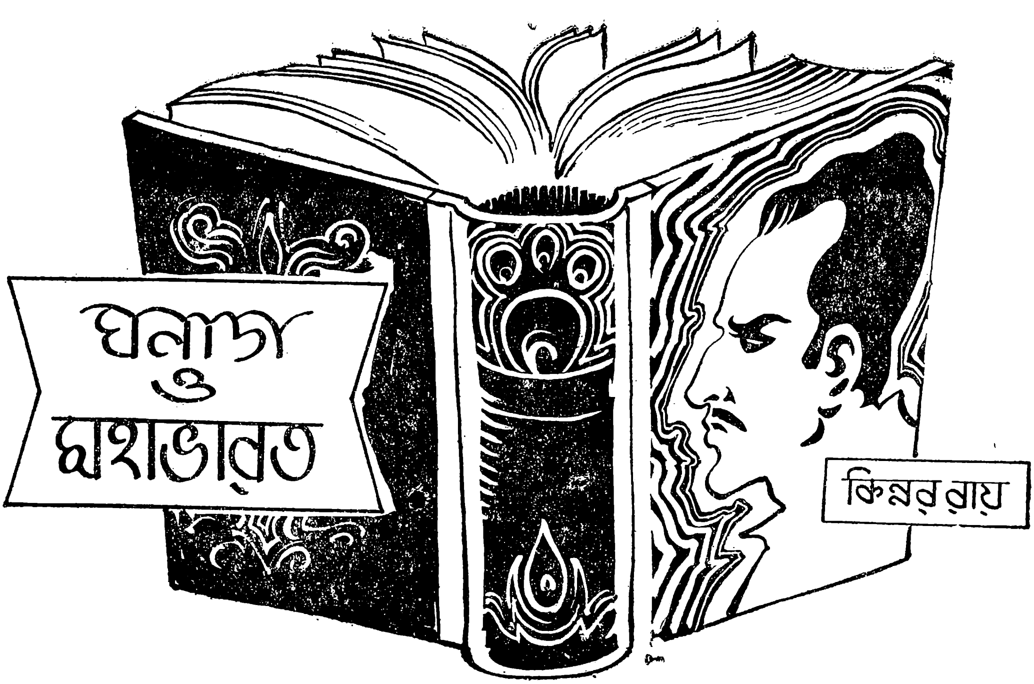

ঘনশ্যাম দাস ভনে…

72 নম্বরের সেই বিখ্যাত টঙের ঘর থেকে কতদূর হস্তিনাপুর, আর কতটাই বা কুরুক্ষেত্র? ধাঁধা হিসেবে প্রশ্নটি একটু হয়ত জটিল। কিন্তু গোটা পৃথিবী, এমন কি পৃথিবীর বাইরেটাও যাঁর কাছে এক টিপ নস্যি, সেই মহামহিম প্রবল প্রতাপান্বিত শ্রীল শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দাস যে সহজেই মহাভারতের চালচুলো ভেঙে এক নিজস্ব মৌরুসিপাট্টা তৈরি করে নেবেন এতে আর আশ্চর্য কি! কাহিনী আর পয়ারের প্যাঁচ পয়জার ফেলে দিয়ে গুছিয়ে বসিয়ে দেবেন নিজের যুক্তিখানি আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে দিয়ে, এতে আর অবাক হওয়ার কি আছে!

এবার একটু বিষয়ে আসি। সম্পাদক বলেছিলেন কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঘনাদা সংখ্যার জন্যে 'মহাভারতে ঘনাদা'—এ নিয়ে কিছু লিখে দিতে। কিংবা ব্যাপারটা এরকমও হতে পারে 'ঘনাদা ও মহাভারত।'

বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং ভূগোল-মনস্ক ঘনাদা যেভাবে সমস্ত পৃথিবীর মানচিত্রটাকে মাথার ভেতর পুরে বেড়িয়েছেন, তেমনি পুরাণ-মনস্কতায় তিনি নতুন নতুন ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন এই মহাকাব্যের—মহাভারতের। আর এটাই তাঁর চরিত্রের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। একটা চালু কথা অনেকদিন শুনতে শুনতে হেদিয়ে গেছি—'যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে।' অর্থাৎ মহাভারতে যা নেই ভূ-ভারতে হাজার ঢুঁড়লেও তা খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই বাজারচলতি কথাটিরও মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে ছেড়েছেন অনেক ঘটনা এবং অ-ঘটনের নায়ক ঘনাদা।

ধরা যাক, 'শান্তি পর্বে ঘনাদা'-কাহিনীটি। আমরা জানি আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, গদা, সৌপ্তিক, ঐষীক, স্ত্রী, শান্তি, অশ্বমেধ, আশ্রমিক, মুষল, স্বর্গারোহণ—মোট আঠারোটি পর্ব মহাভারতের। 'শান্তি পর্বে ঘনাদা'য় আমরা দেখতে পাই হবুচন্দ্র রাজা আর গবুচন্দ্র মন্ত্রীর দেশের ছবি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরের সেই ভারতবর্ষে রাজা আছে, রাজপাট আছে, কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা, বিবেক-বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে, যেন আজকেরই ভারতবর্ষ বা তৃতীয় বিশ্বের কোন দেশ। ইঁদুরের চেহারা বাড়তে বাড়তে দাঁড়িয়েছে বুনো বরার সমান। কলেবর স্ফীতির কারণ ঘুষ। বাঁ হাতে নগদ নারায়ণ না গুঁজে দিলে কোন কাজই হয় না। সমস্ত রকম লেনদেন ব্যবসা-বাণিজ্য, দেয়া-নেয়া নীতির ওপর দাঁড়িয়ে, এমনই রাজ্যের অবস্থা। সেখানে যুধিষ্ঠিরের সভায় যখন রাজানুগ্রহী ব্রাহ্মণেরা নানান উপাচার পেয়ে শুধুই রাজার বন্দনা করছেন, তখন চার্বাক ঢুকলেন।

'জয়দ্রথ বধে ঘনাদা'য় আমরা ঘনাদাকে দেখি শুধু পুরাণবেত্তা বা মহাভারতের নব-ভাষ্যকার হিসেবেই নয়, তাঁকে আমরা পেয়ে যাই একজন বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী মানুষ হিসেবেও। ঘনাদার কথা অনুযায়ী জয়দ্রথ বধের যে প্রতিজ্ঞা অর্জুনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, তা আসলে অর্জুনের কথা নয়। শ্রীকৃষ্ণই অর্জুনের হয়ে উচ্চারণ করেছিলেন প্রতিজ্ঞা-বাক্য।

এখানে ঘনাদার ব্যাখ্যায় শ্রীকৃষ্ণ একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী (এস্ট্রোনমার)। গ্রহ-নক্ষত্রের পরিক্রমা, গতি—সমস্তই তাঁর নখদর্পণে। তিনিই আসলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সূর্যাস্তের পূর্বে জয়দ্রথকে হত্যা করবেন। কারণ তাঁর হিসাব মতো পরদিনই পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ। ঘনাদার ব্যাখ্যা অনুযায়ী সুদর্শন চক্রে সূর্যকে ঢেকে ফেলেননি শ্রীকৃষ্ণ। গ্রহণের নিয়ম অনুযায়ী সূর্য আপনিই মুখ লুকিয়েছিল ছায়ার পেছনে। আর প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী অর্জুন জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ-ত্যাগ করবেন—এই আনন্দে নাচতে নাচতে বেরিয়ে এসেছিল জয়দ্রথ। তারপরই অর্জুনের বাণে তার গলা পড়ল কাটা। আর বাণে বাণে সেই মুণ্ডু উড়ে গিয়ে পড়ল জয়দ্রথেরই বাবার কোলে। তখনই সূর্য উঁকি দিল আকাশে। সুদর্শনে সূর্য ঢাকার উপাখ্যান থেকে গ্রহণের হিসেব কষে জয়দ্রথ আর কৌরবদের প্যাঁচে ফেলা ব্যাপারটা অনেক বাস্তবসম্মত। সেখানেই কাশীরাম দাস কাত, ঘনশ্যাম দাসের জিত।

তিন নম্বর গল্প 'ঘনাদার শল্য সমাচার'।

যুধিষ্ঠিরের হাতে শল্য কিভাবে নিহত হলেন, এখানে তার ব্যাখ্যা। মহাভারতের কাশীদাসী পয়ার সামান্য পাল্টে ঘনাদা বলছেন যুধিষ্ঠিরের বাঁদিকে নকুল, সহদেব ছিল না। ছিল দু পাশে। তার ফলে শ্রীকৃষ্ণের শেখানো মত করুণ গলায় চেঁচিয়ে উঠেছিল নকুল সহদেব, শল্যের আপন ভাগ্নেরা—'মামা, মামাগো!' যেন মামার বাণে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে দুই ভাগ্নের এই চিৎকার, শেষ আর্তনাদ। ব্যাস, আপন ভাগ্নে - নিজের মায়ের পেটের বোন মাদ্রীর দুই ছেলে এমন করুণ কণ্ঠে ডাকছে কেন ভাবতে গিয়েই শল্য হয়ে পড়লেন অন্যমনস্ক। আর সেই সুযোগে যুধিষ্ঠিরের বাণ তাঁকে পেড়ে ফেলল। ঘনাদার কথা অনুযায়ী যুধিষ্ঠির অবশ্য জানতেন না শ্রীকৃষ্ণের এই চাতুরি। স্বজনের প্রতি দুর্বলতা—মানবচরিত্রের এই দিকটি নিয়েও ঘনাদা একচোট মুচড়ে দিলেন কাশীরাম দাসকে। এবারেও ঘনাদার ব্যাখ্যার কাছে কাশীরাম হেরে গেল।

এখানেই শেষ নয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ফলাফল কেন পাণ্ডবদের পক্ষে গেল তা নিয়ে ঘনাদার বিশ্লেষণ প্রায় বিশ্বকাপ বিজয়ী ফুটবল দলের কোচের মত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আঠারো না উনিশ দিনের তা নিয়ে ঘনাদার সিদ্ধান্ত, যুদ্ধ হয়েছে আঠারো নয় উনিশ দিন। কারণ, যুদ্ধের আগের দিনই কুরুক্ষেত্রের পাথুরে এবড়ো-খেবড়ো জায়গাটার দখল দিয়ে পাণ্ডবরা যুদ্ধের ফলাফলকে প্রায় নিজেদের কব্জা করে নিয়েছিল। খাণ্ডবদাহে শ্রীকৃষ্ণের প্যাঁচ তো ভোলার কথা নয়। কিভাবে বোকা বানালেন অগ্নিদেবকে, সে কাহিনী যেমন অনুপম, তেমনি অসামান্য। কুরুক্ষেত্রে ভগদত্তের সম্পূর্ণ বলবীর্য না দেখতে পাওয়ার কারণ নিয়ে ঘনাদার ব্যাখ্যা, দুর্যোধনের শ্যালক উলুকের ব্যবহার ও ঘুষখোরি স্বভাব। ভগদত্তের হাতি ফিরিয়ে দেয়া এবং যাবতীয় বাজে মাল নিয়ে কৌরবদের যুদ্ধ চালানো যে যাবতীয় গণ্ডগোলের কারণ সেকথাও আবিষ্কার করলেন ঘনাদা। সত্যিই তার জুড়ি নেই।

এতসব লেখালেখির পর মহাভারতে যা নেই, অথচ হয়েছিল এমন আরও কিছু ঘটনার সুলুক নিতে দুরু দুরু বক্ষে হাজির হয়েছিলুম 72 নম্বরের টঙের ঘরে। শিশির, শিবু, গৌর কারুর সঙ্গেই দেখা হলো না। সকলেই বোধহয় বড্ড ব্যস্ত। কাউকে কোথাও না দেখতে পেয়ে বনোয়ারিকেই শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার, আছেন নাকি উনি? বনোয়ারি বাংলা মেশানো হিন্দীতে যা বলল, তার অর্থ দাঁড়ায় এইরকম—কয়েকদিন থেকেই ওপরের ঘর থেকে কোনো সাড়াশব্দ নেই তেমন। খাবার-দাবারেরও........

আমার আর তর সইল না। হুড়মুড়িয়ে ওপরে উঠে এসে দেখলাম টঙের ঘরে মস্ত তালা। সামনে দরজার ওপর সাদা কাগজে লাল কালিতে বড় বড় করে লেখা।

'হ্যালিকে হ্যালো করতে
ঠিক ঠিক ফলো করতে
যাচ্ছি
কয়েকদিন গবেষণা দেখাটেখা
ষোলো আনা শেষ করে
ফিরছি।'

ঘনাদা হ্যালির ধূমকেতু দেখতে কোথায় গেলেন, আপাতত কেউ জানে না। কবে ফিরবেন তাও বোধহয় না। তিনি কি ধূমকেতুর সঙ্গে মহাভারতের কোনো যোগাযোগ খুঁজে পেলেন। যুদ্ধ-ধূমকেতু বিজ্ঞান—সব মিলিয়ে কি দাঁড়ায়, তাই দেখার জন্যেই কি এই অভিযান? নাকি তাঁর এই বেরিয়ে পড়া মো-কা-সা-বি-স-এর চ্যালেঞ্জের উত্তরে?

খুব মন খারাপ নিয়ে ফিরে আসা।

নামার আগে টঙের ঘরের দরজার সামনে নামিয়ে দিয়ে এলাম ভালো রসোমালাই এক হাঁড়ি, অবশ্যই বাগবাজারের, আর দামি সিগারেটের একটা প্যাকেট। এখন তো আর টিন দেখি না বাজারে। এসব তাঁর জন্যেই নেয়া ছিল।

সাদা কাগজের ওপর কালো কালিতে দুটো লাইন রসোমালাইয়ের কাগজের ঢাকনায় পিন দিয়ে গেঁথে এসেছি নেমে আসার আগে। জানি না তা ঘনাদার হাতে এতদিনে পৌঁছে গেছে কিনা।

আসলে যে কথা তাঁকে বলতে গেছিলাম তারই সার-বস্তুটুকু এ দু লাইনে—

নব (মহা)-ভারতের কথা অমৃতসমান
ঘনশ্যাম দাস ভনে শুনে পুণ্যবান

1এ মুখার্জি পাড়া লেন, কল-26

তামাম বিশ্বের নেতৃবর্গের সঙ্গে ঘনাদার যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকবে তাতে আর অবাক হবার কি আছে! তবে যোগাযোগ থাকলেও তো আর আমাদের জানার সুযোগ নেই। ঘনাদা নিজের থেকে আগ বাড়িয়ে সে সব কথা বলতে লজ্জা পান। আর যোগাযোগের কারণ তো রাজনৈতিক সঙ্কট সমাধানের জন্য মুশকিল আসান ঘনাদার শরণাপন্ন হওয়া। তাই সেসব কথা ফলাও করে বাইরে বেরোবারও সুযোগ তেমন নেই।

রুজভেল্ট কি আইসেনহাওয়ার তাঁকে কোন দায়িত্ব দিয়ে থাকলে তা চিরকাল গোপনই থেকে গেছে। কিন্তু ঘনাদার কর্মক্ষেত্রের পরিধি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী, জার্মানীর চান্সেলার ফান্সের প্রেসিডেণ্ট, জাপানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল গভীর। এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের নেতৃবর্গের সঙ্গেও তাঁর রাজনৈতিক যোগাযোগ ছিল। তবে ঘনাদা সেসব কথা প্রকাশ করেননি লজ্জায়।

যে অসাধারণ যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে ঘনাদা বিচরণ করেন তাতে তাঁকে যে মুশকিল আসানের জন্যে সকলের প্রয়োজন হবে সেটাই তো স্বাভাবিক। স্বভাবলাজুক ঘনাদা নিজের শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে কোন দিনই নিজের মুখে কিছু বলেন নি। অথচ তিনি সমান দক্ষতার সঙ্গে বহু ভাষায় কথাবার্তা চালিয়ে যান। প্রাচীন সংস্কৃত, ল্যাটিন ছাড়াও তিনি সবকটি ভারতীয় ভাষা, ইংরাজী, ফরাসী, জার্মান, চীনা, রুশ, তিব্বতী, জাপানী, সোহাহিলি আরবী, ফারসী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় সমান দক্ষতার সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারেন, লেখালিখি করতে পারেন। রিভলবার সঙ্গে থাকলেও সেটি ব্যবহারের খুব একটা প্রয়োজন হয় না। মাত্র কয়েকটি স্বদেশী প্যাঁচেই তিনি দুর্বৃত্তদের মোকাবিলা করে থাকেন। এ হেন ঘনাদাকে যে বিশ্বের কূটনীতিবিদদের প্রয়োজন হবে বিভিন্ন কারণে এতে অবাক হবার কিছু নেই। ঘনাদা তো নিজের প্রয়োজনে তাঁদের কাছে যান নি কখনো। তাঁরাই বরং বিভিন্ন দরকারে গোপনে ঘনাদাকে ডেকে নিয়ে গেছেন। ভারত সরকারও ঘনাদাকে ইনটারন্যাশনাল পাশপোর্ট দিয়ে ধন্য হয়েছেন।

গোপন কাজে ঘনাদা যখন বাইরে যান নিজের পরিচয় তিনি সাধারণত দিয়ে থাকেন ব্যবসায়ী বা পর্যটক হিসেবে। স্রেফ নিজেকে গোপন রাখার উদ্দেশ্যেই। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করার মহাদায়িত্ব ভার রয়েছে তাঁর মাথায়। দুষ্ট দমনের আগে ঘনাদা অবশ্য নিজের আসল পরিচয়টি তাকে দিয়েছেন। এ '—অধীনের নাম ঘনশ্যাম দাস।'

বৃটিশ সরকারের গোপন নির্দেশ পেয়ে ঘনাদা আটলাণ্টিক মহাসাগরের তলদেশের গোপন মানচিত্র চুরির কু-মতলবকে বানচাল করেন। অসামান্য বৈজ্ঞানিক নর্মান জোয়াকিমকে তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করার সুযোগ ঘনাদাই করে দিয়েছিলেন। এটা যে তিনি করতে পেরেছিলেন তার জন্য অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড সরকার যৌথভাবে ঘনাদার কাছে কৃতজ্ঞ। চাকরী করার ছুঁতোয় দক্ষিণ

শিল্পী ধীরেন বলের চোখে ঘনাদা

হ্লো বেড়ালের ডাককেই ঘনাদা খ্নে তিনি অর্সি'ন্যাস অর্কা'র ডাক বলে যদি ভুল না করতেন তা হলে আমরা ঠগবাজ কাউণ্ট কার্ণে'রা'র কথা জানতে পারতাম না। ঘনাদা তখন আমেরিকার পশ্চিম উপকুলে স্যামন মাছ শিকারী জেলেদের এক সর্দারের অতিথি হয়ে আছেন। হঠাৎই টেলিগ্রাম এল.........

ডান দিকে জেলে সর্দার বাঁ দিকে ঘনাদা

আফ্রিকায় গিয়ে ঘনাদা হের ফিংকের কারাকুল ভেড়া চুরির কু-মতলব বানচাল করেছেন।

তাইওয়ান সরকারের অন্রোধে ঘনাদা চিংসুনকে দলবল-সহ সলিল সমাধি দেন। তাঁর এই মহৎ কাজের জন্যেই ল্প্তপ্রায় সাগর ভোঁদড়ের অস্তিত্ব থেকে গেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডমোরি মথের অদ্ভুত আচরণ ঘনাদার পক্ষেই জানা সম্ভব।

মহাসাগরের ব্কে যখন কোন অজ্ঞাত কারণে জাহাজে পরপর বিস্ফোরণ শ্র্ হয় তখন জাপান সরকার দিশেহারা হয়ে গোপনে ঘনাদার সাহায্য প্রার্থনা করেন। জাহাজে যে গোপনে আণবিক ঘড়ি পাচার হচ্ছিল ঘনাদাই তা গোপন অন্সন্ধান চালিয়ে বের করেন। তারপর দ্ষ্টচক্র ধ্বংস করে সেই সব ঘড়ির সলিল সমাধি ঘটান। তা না হলে আরেকটা নাগাসাকি-হিরোসিমা ঘটে যেতে পারতো।

ঘনাদা লাজ্ক স্বভাবের মান্ষ। নিজের প্রচার নিজে চান না। তা না হলে বিশ্বের তাবড় তাবড় নেতৃবর্গ যাঁর সঙ্গে বন্ধ্ত্ব স্ত্রে বা কর্ম'স্ত্রে আবদ্ধ, যাঁর সাহায্য ব্যতিরেকে বহ্ স্কর্ম'ই অসম্প্ণ' থেকে যেত, তিনি ইচ্ছে করলেই কি আর নিজের দেশের রাষ্ট্রনায়ক হতে পারতেন না। নিশ্চয়ই পারতেন। নেহাতই তিনি প্রতিশ্র্তিবদ্ধ হাইতি দ্বীপে তাঁর বন্ধ্র কাছে যে কখনো রাজনীতির নোংরামিতে নিজেকে তিনি জড়িয়ে ফেলবেন না।

ঘনাদার দেখা পাওয়া

অরিজিৎ দত্ত

জ্ড়ি নাই ঘনাদার
প্রতিভার কণা তাঁর
পাই বই পড়ে।
তব্ আশ মেটে নাই
আরো কিছ্ পেতে চাই
ছ্টি তাঁর দোরে।
রাস্তাটা গ্বলেট
হচ্ছিল খ্ব লেট
ব্যাপারটা বোঝ।
দিল এক তস্কর
বনমালী নস্কর।
রাস্তার খোঁজ।
কবে কোন ঘোর রাতে
ম্খ ঢেকে বোরখাতে
হয়েছিল বের।
বাড়ী সেই রাস্তায়
ঘনাদার বাস তায়
ভাগ্যের ফের।
হাসি আমি প্রাণ খোলা,
খেয়েছিলে কান মোলা
তুমি তাঁর হাতে?
চোর বলে, রাম রাম
তাঁকে দেখে নামলাম
সোজা রাস্তাতে।
জেনে রাখ বাড়ী খোঁজা
নয়তো হে ভারী সোজা
হদিস না দিলে।
গলি খ্ঁজি ডানে বাঁয়
পড়ে যাবে ঝামেলায়
চমকাবে পিলে।
শ্নে নির্দে'শ তার
খ্ঁজে পাই মেস তাঁর
কড়া নাড়ি জোরে।
রামভ্জ আসে নেমে
শিশিরদা পাশে ঘেমে
দেখা দিল দোরে।
কি ব্যাপার কাকে চাই?
আমি বলি, তাঁকে ভাই
পাব তাঁর দেখা?
উত্তরে শ্নি হায়
তিনি ভোরে ম্যানিলায়
যান চলে একা।

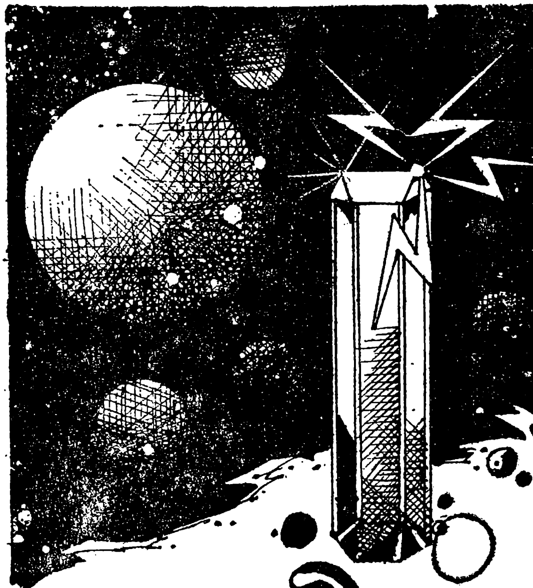

অমল থীয়ার রহস্য

নিরঞ্জন সিংহ

[বারো]

শেষ বোঝাপড়া

নিটোভস্কীর কথা শেষ হতে না হতে রবার্ট বলে উঠল, 'নিটো স্পেস-স্যুটটা পরে নে—কুইক।' কথা শেষ করেই মেঝে থেকে দড়িটা কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে গেল ও মিঃ ব্রাডুদের চেম্বারের দিকে। মিঃ ব্রাডু তখনো অঘোরে ঘুমুচ্ছিলেন। ঘুমন্ত মিঃ ব্রাডুকে চটপট দড়ি দিয়ে ভাল করে বেঁধে ফেলল রবার্ট।

ততক্ষণে নিটোভস্কীর স্পেস স্যুট পরা হয়ে গিয়েছিল। রবার্ট ফিরে এসে বলল, 'মিঃ ব্রাডুকে বেঁধে রেখে এলাম, যাতে ঘুম ভাঙলে কোন ঝামেলা পাকাতে না পারেন।'

সবাই খুশি হল রবার্টের কাজে। তারপর একে একে ওরা উল্কা থেকে নামতে শুরু করল। চন্দ্রনাথবাবু বাইরে থেকে 'উল্কা'র দরজা লক করে চাবিটা পকেটে পুরে নিলেন।

'উল্কা' থেকে নেমে ওরা সেই টিলাটার দিকে পা বাড়াল। সাদিক বলল, 'আঙ্কল, মিঃ চার্লসের হাতে রে-গান বা নারকোটিক গান থাকা মোটেও অস্বাভাবিক নয়, এ অবস্থায় বিনা অস্ত্রে ওঁর মুখোমুখি হওয়া কি উচিত হবে ?

চন্দ্রনাথবাবু বললেন, 'সাদিক ঠিকই বলেছে। তবু মিঃ চার্লসের মুখোমুখি না হয়ে আমাদের কোন উপায় নেই। মিঃ চার্লস ছাড়া 'উল্কা' নিয়ে আমরা আরোতে ফিরব কি করে ? এ অভিযানে উনিই একমাত্র মহাকাশযান পরিচালক। তাই ঝুঁকি আমাদের নিতেই হবে। তোমরা বাঁদিকের ওই ছোট্ট ছোট পাথরের ঢিবিগুলোর আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে সাবধানে এলোও, তাহলে হঠাৎ মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। আর খবরদার এখন থেকে কেউ কোন কথা বলবে না, তাহলে মিঃ চার্লস সজাগ হয়ে যেতে পারেন।'

চন্দ্রনাথবাবুর কথামত ওরা পাথরের ঢিবিগুলোর আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে এগুতে লাগল। উত্তেজনায় ওদের বুকের মধ্যে তখন হাতুড়ি পিটছে। চন্দ্রনাথবাবু চলেছেন সবার আগে আগে। যেখানে পাথরের ঢিবি শেষ হয়ে ফাঁকা জায়গা সেখানটা ওরা ছুটে পার হয়ে সামনের ঢিবিটার আড়ালে এসে পেঁছুচ্ছে। এভাবে সাবধানে ওরা প্রায় সেই টিলাটার কাছে এসে পেঁছুলো। সবার চোখে চোখে ইশারা খেলে গেল। টিলার নিচে একটা গুহামুখ সাদিক আর নিটোভস্কী একলাফে এগিয়ে গিয়ে গুহামুখের পাশের বড় পাথরটার আড়ালে আত্মগোপন করল। রবার্ট, সমীর আর চন্দ্রনাথবাবু রইলেন গহ্মমুখ থেকে একটু দূরে আর একটা বড় পাথরের আড়ালে। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ অপেক্ষা করল ওরা। কিন্তু মিঃ চার্লসের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। সত্যিসত্যি উনি গুহার ভিতরে আছেন কিনা তা ওরা বুঝতে পারল না।

নিটোভস্কী পাথরের আড়াল থেকে মুখ বের করে গুহামুখে উঁকি মারল। ওর ইচ্ছে গুহার মধ্যে ঢুকে মিঃ চার্লসকে খুঁজে বের করা। ও এক পা এগুতেই সাদিক ওকে বাধা দিল।

ঠিক তক্ষুনি ওদের ইয়ার-ফোনে ভেসে এলো কতক-গুলো সাংকেতিক শব্দ। এ শব্দগুলো বেতারে ট্রান্সমিট করা হচ্ছে। নির্ঘাৎ মিঃ চার্লস অন্যকোন ট্রান্সমিটারের সাহায্যে আয়োতে ওই সাংকেতিক শব্দগুলো পাঠাচ্ছেন। কার কাছে পাঠাচ্ছেন ? চন্দ্রনাথবাবু বুঝতে পারলেন এই গোপন সংবাদ নিশ্চয় পেঁছে দেওয়া হচ্ছে প্রজেক্ট ডিরেক্টরের কাছে। সাংকেতিক শব্দগুলোর মানে উদ্ধার করার চেষ্টা করলেন উনি, কিন্তু পারলেন না। একসময় থেমে গেল সাংকেতিক শব্দ পাঠানো। ওরা সজাগ হয়ে উঠল। মিঃ চার্লস সম্ভবতঃ গুহার মধ্যে রয়েছেন। ওরা অপেক্ষা করতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে গুহামুখে দেখা গেল মিঃ চার্লসের চেহারা। বাঁ হাতে একটা ছোট্ট পোর্টেবল

ট্রান্সমিটার আর ডান হাতে সেই মারাত্মক সাতটা রে-গানের একটি।

নিটোভস্কী চট করে পিছিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে একখানা বড় পাথর তুলে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইল। মিঃ চার্লস এগিয়ে গেলেই পিছন থেকে মাথায় আঘাত হানতে হবে। সাদিকের সঙ্গে চোখেচোখে ইশারা হয়ে গেল। সাদিকও নিটোভস্কীর পিছনে আর একখানা বড় পাথর তুলে নিয়ে তৈরী হ'ল। মিঃ চার্লস বেশখুশিমুখে ওদের ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিটোভস্কীর হাতের পাথরটা ছুটে গেল মিঃ চার্লসের মাথা লক্ষ করে। আচমকা আঘাতে মিঃ চার্লস টাল সামলাতে না পেরে সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। বাঁ হাত থেকে ছিটকে পড়ল ট্রান্সমিটারটা। হঠাৎ সাদিক একলাফে এগিয়ে গেল ট্রান্সমিটারটা কুড়িয়ে নেওয়ার জন্য। কিন্তু ততক্ষণে মিঃ চার্লস নিজেকে সামলে নিয়েছেন। অমলথীয়ার মাধ্যাকর্ষণ খুবই কম, তাই বড় পাথরের আঘাতে মোটেও কাবু হন নি মিঃ চার্লস। সাদিককে সামনে দেখে প্রায় ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন মিঃ চার্লস। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। পর মুহূর্তে ও'র চোখদুধো জ্বলে উঠল হিংস্র নিষ্ঠুরতায়। হাতের রে-গানটা তাক করে ধরলেন সাদিকের দিকে। পাথরের আড়াল থেকে ওরা এ দৃশ্য দেখে চমকে উঠল। সাদিক উঠে দাঁড়িয়ে হতবম্ভ হয়ে পড়েছিল। নড়াচড়া করতে পর্যন্ত যেন ভুলে গেছে ও, সম্মোহিতের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে ফাাকাশে মুখে। মিঃ চার্লস চিবিয়ে চিবিয়ে বলে উঠলেন, 'ভেবেছিলাম নিজের হাতে আর খুনটুন করব না, কিন্তু তা আর হ'ল না।

মিঃ চার্লসের কথা শেষ হতে না হতে কোথা দিয়ে কী যেন ঘটে গেল। একটা বিরাট পাথরের চাঙড় এসে লাগল ও'র ডান হাতের কব্জীর উপর। মিঃ চার্লসের হাত থেকে ছিটকে পড়ল রে-গানটি। মাটিতে পড়ার আগেই উদ্গীরণ করল এক ঝলক মারাত্মক প্রাণঘাতী আগুনের হলকা। একটুর জন্য বেঁচে গেল সাদিক। ওর হতবম্ভভাবটা ততক্ষণে কেটে গিয়েছিল। ও ছুটে গিয়ে জাপটে ধরল মিঃ চার্লসকে। পরমুহূর্তে নিটোভস্কী, রবার্ট, সমীর ও চন্দ্রনাথবাবু পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ঘিরে ধরলেন মিঃ চার্লসকে। আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন মিঃ চার্লস।

মিঃ চার্লসকে নিয়ে ওরা 'উল্কা'য় ঢুকল। ইতিমধ্যে মিঃ ব্রাডুর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় উনি চেঁচাতে শুরু করেছেন, 'না—না সোনার ভাগ আমি কাউকে দেব না। অমলথীয়ার সোনার পাহাড় সব আমার।' রবার্ট ছুটে গিয়ে টেপ-রেকর্ডারটা চালু করে দিল মিঃ ব্রাডুর কথাগুলো টেপ করার জন্য। মিঃ ব্রাডুর কথা টেপ হয়ে চলল, 'না—না সোনার ভাগ আমি কাউকে দেব না… …মিঃ চার্লসকেও দেব না………ডিরেক্টরকেও দেব না… ……এ সোনা সব আমার………সব………।'

চন্দ্রনাথবাবু আস্তে মিঃ ব্রাডুর কেবিনের দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিলেন। মিঃ চার্লসকে বসিয়ে দেওয়া হল কন্ট্রোলরুমের চেয়ারে। ও'কে ঘিরে বসল, রবার্ট, সাদিক, সমীর আর নিটোভস্কী। নিটোভস্কীর হাতে সেই মারাত্মক রে-গানটি। মিঃ চার্লসকে কব্জা করার পর রে-গানটা কুড়িয়ে নিয়েছিল নিটোভস্কী। চন্দ্রনাথবাবু আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করতে চান না এখানে। উনি মিঃ চার্লসকে নির্দেশ দিলেন 'উল্কা' চালু করার জন্য।

মিঃ চার্লস কোন কথা বললেন না। ভিতরে ভিতরে উনি ফুলছিলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওদের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে কণ্ট্রোলবোর্ড পরীক্ষা করতে ভীষণ গর্জন করে রকেট চালু হয়ে গেল। হু হু করে উপরে উঠতে শুরু করল উল্কা। ভিউফাইণ্ডারে ভেসে উঠল বৃহস্পতির বিশাল রহস্যময় চেহারা। নিচে অমলথীয়ার রঙীন চেহারা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে লাগল।

চন্দ্রনাথবাবু একপাশে বসে দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

সাদিক ও'কে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, 'আঙ্কল নিচে হারিয়ে গেল মিঃ ব্রাডুর সোনার পাহাড়।'

রবার্ট বলল, 'মিঃ ব্রাডু যখন বুঝতে পারবেন যে সোনার পাহাড় ফেলে রেখেই আমরা আয়োতে ফিরে যাচ্ছি ভদ্রলোক তখন নির্ঘাৎ পুরো পাগল হয়ে যাবেন।'

রবার্টের কথায় নিটোভস্কী বলে উঠল, 'ভগবানকে ধন্যবাদ যে আমরা সবাই সুস্থ শরীরে আয়োর পথে রওনা হতে পেরেছি। সোনালোভী শয়তানদের ইচ্ছে পূর্ণ হলে কি যে ঘটত তা ভাবতেও আমার ভয় করেছে।'

সমীর মন্তব্য করল, 'সত্যি একবারও আমাদের মনে হয় নি যে ওঁরা সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে এই অভিযানে যোগ দিয়েছেন।'

চন্দ্রনাথবাবু এতক্ষণে কথা বললেন, 'আমি ভাবছি প্রজেক্ট ডিরেক্টরের কথা। কি ভয়ঙ্কর শয়তান লোক। জেনেশুনে ঠাণ্ডা মাথায় আমাদের মৃত্যু পরোয়ানায় সই দিয়েছিলেন। এর উপযুক্ত শাস্তি ও'কে পেতে হবেই।' চন্দ্রনাথবাবু একটু থামলেন। তারপর একটু কঠিনস্বরে বলে উঠলেন, মিঃ চার্লস, আপনাদের গোটা পরিকল্পনাটা একটু বুঝিয়ে বলবেন ? জানতে আমাদের খুব কৌতূহল হচ্ছে।'

মিঃ চার্লস মুখ ঘুরিয়ে চন্দ্রনাথবাবুর মুখের দিকে তাকালেন, কিন্তু কোন কথা বললেন না।

চন্দ্রনাথবাবু একটু হাসলেন। তার পর বললেন, 'ঠিক আছে, আপনার যদি বলতে অসুবিধে থাকে তাহলে আমিই বলছি। ভুল হলে শুধরে দেবেন।' চন্দ্রনাথবাবু

একটু থামলেন। তারপর বলতে শুরু করলেন, সমস্ত ঘটনা পর্যালোচনা করে যা বুঝতে পারছি তা হচ্ছে অমলথীয়ায় ভারি মৌলিক পদার্থ থাকার সম্ভাবনার কথা প্রজেক্ট ডিরেক্টর জানতেন। ভারি মৌলিক পদার্থ সোনা বা প্লাটিনাম হতে পারে। লোভ জাগল ওঁর মনে। যখন বিশ্ব সরকার অমলথীয়ায় গোপন-অভিযান পাঠাবার জন্য অনুমতি ছিলেন তখনই প্রজেক্ট ডিরেক্টর মনস্থির করে ফেললেন। মিঃ চার্লস ও মিঃ ব্রাডুকে উনিই নির্বাচিত করেছিলেন। তখনই নিশ্চয় গোপন আঁতাত তৈরি হয় এবং অমলথীয়ায় সোনা বা প্লাটিনাম খুঁজে পেলে তার বখরা কেমন হবে তাও স্থির হয়ে যায়। এও স্থির হয় যে অমলথীয়ায় সত্যিসত্যি সোনা বা প্লাটিনাম খুঁজে পেলে আমাকে খতম করে সেইসব সোনা বা প্লাটিনাম নিয়ে আয়োতে ফিরে যাওয়া। তারপর প্রচার করে দেওয়া যে কোন দুর্ঘটনায় আমার মৃত্যু হয়েছে। কে আর খোঁজ নিতে আসত। তারপর যেকোন উপায়ে হোক মহাকাশযান থেকে সোনা বা প্লাটিনাম সরিয়ে ফেলে নিজেদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করে নিতেন। আর অমলথীয়ায় যদি সোনা বা প্লাটিনামের কোন খোঁজ না পাওয়া যেত তাহলে হয়তো আমার উপর কোন হামলা হত না। শান্তভাবে অভিযান শেষ করে সবাই আয়োতে ফিরে আসতাম। কিন্তু যেই আমি তোমাদের এই অভিযানে সঙ্গে নেওয়ার ব্যবস্থা করলাম, প্রজেক্ট ডিরেক্টর খুব বিচলিত হয়ে পড়লেন। খুব সম্ভবতঃ তিনি সেণ্টুকে হাত করেছিলেন তোমরা যাতে অভিযানে না যেতে পার সেইরকম কোন ব্যবস্থা করার জন্য। খাবারের সঙ্গে কিছু মিশিয়ে খাইয়ে দিলে তোমরা গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়তে এবং সেক্ষেত্রে অভিযানে অংশগ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হত না। যাহোক সেণ্টু বেফাঁস কথা বলে ফেলার জন্য আমি ওকে চেপে ধরলাম। সেণ্টু ভয় পেয়ে প্রজেক্ট ডিরেক্টারের কথামত কাজ করল না। ডিরেক্টর মশায় পড়লেন অসুবিধেয়, কিন্তু প্ল্যান বদলালেন না। শুধু খুনের সংখ্যা দাঁড়ালো এক থেকে পাঁচে। তা খুনীর কাছে একটা খুনও যা পাঁচটা খুনও তাই। আমরা যাতে অমলথীয়া থেকে সরাসরি কোন সাহায্যের কথা আয়োতে জানাতে না পারি সেইজন্য লুকিয়ে নেওয়া হল বাড়তি পোর্টেবল্ ট্রান্সমিটার এবং ঠিক করা হ'ল মহাকাশযানের ট্রান্সমিটার অমলথীয়ায় নেমে প্রথম সুযোগেই নষ্ট করে দেওয়া হবে। মহাকাশযান থেকে অস্ত্রশস্ত্রগুলোও সরিয়ে ফেলা হবে যাতে আমরা ওগুলো আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করতে না পারি। বাড়তি ফুয়েল সেলদুটো সারানো হয়েছিল ট্রান্সমিটারটাকে চাল করার জন্য যেকথা প্রথমে আমরা বুঝতে পারিনি। যাহোক অমলথীয়ায় নামার পর প্রথম সুযোগেই প্ল্যানমত কাজ করে ফেললেন মিঃ চার্লস ও মিঃ ব্রাডু। 'উল্কায় চুরির ব্যাপারে আমরা যতখানি বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম মিঃ চার্লসরা তা হননি। কারণ তাঁরা ভাল করেই জানতেন যে অস্ত্রশস্ত্র ও ফুয়েল-সেল অমলথীয়াবাসীরা চুরি করেনি এবং 'উল্কা'র ট্রান্সমিটারও তারা নষ্ট করে নি। জল-তরঙ্গের বাজনার ব্যাপারটা নিয়ে ওঁরা খুব একটা মাথা

ঘামান নি বলেই মনে হয়। তাই আমরা যখন অমলথীয়া ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ঠিক করলাম তখন মিঃ চার্লস ও মিঃ ব্রাড্‌ যথেষ্ট সাহস দেখিয়ে বিপদের মোকাবিলা করতে চাইলেন। তার কারণ এখন তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছ—। তার কারণ ওঁরা যা খুঁজতে এখানে এসেছিলেন তখনও তার সন্ধান করে উঠতে পারেন নি। সুতরাং তক্ষুনি আয়োতে ফিরে যাওয়া চলে না। যাহোক অমলথীয়ার সোনারঙের পাহাড় দেখে মিঃ ব্রাড্‌ ভাবলেন তাঁরা যা খুঁজতে এসেছিলেন তা পেয়ে গেছেন। কিন্তু সোনার পাহাড় ওঁর মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে দিল। আমার মনে হচ্ছে মিঃ ব্রাডের অবস্থা মিঃ চার্লস বুঝতে পেরেছিলেন। ওঁর ভয় হচ্ছিল মিঃ ব্রাড্‌ যদি এ অবস্থায় বেফাঁস কিছু বলে ফেলে পুরো প্ল্যান ভণ্ডুল করে দেন তাহলে ওঁদের অভিযানটাই ব্যর্থ হবে। তাই উনি ঠিক করলেন যা করতে হবে তা খুব তাড়াতাড়ি। সিদ্ধান্ত গর্তের মধ্যে। যে গর্ত অমলথীয়া বাসীদের পাতালপুরীতে ঢুকবার রাস্তা। মিঃ চার্লস বুঝতে পারলেন সাহায্য ছাড়া এখান থেকে বেরুনো অসম্ভব। তাই বাধ্য হয়ে সাহায্য চাইলেন। কিন্তু রবার্টের সাড়া পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মতলব ভেঁজে ফেললেন। রবার্ট আর সাদিক যখন গর্তের মুখের কাছে পৌঁছুলো তখন উনি ভিতরের দিকে গা ঢাকা দিলেন। রবার্ট আর সাদিক দড়ি বেয়ে গর্তে নামল। কিন্তু মিঃ চার্লসকে দেখতে না পেয়ে যখন ফিরে যাওয়ার মতলব করল তখন মিঃ চার্লস গোঙানীর আওয়াজ করে তাদের ভিতরে টানার চেষ্টা করলেন। ওরাও মিঃ চার্লসের ফাঁদে পা দিল সরল মনে। রবার্ট আর সাদিক ভিতরের দিকে এগিয়ে যেতেই মিঃ চার্লস ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে দড়ি বেয়ে উপরে উঠে পড়লেন এবং দড়িটা গুটিয়ে পকেটে ভরে নিলেন। তারপর যখন আমাদের সঙ্গে দেখা হ'ল আমি বললাম আপনি বিশ্রাম নিন আমরা রবার্ট ও সাদিককে খুঁজে দেখি। তখন মিঃ চার্লস একটু ঘাবড়ে গেলেন। ভাবলেন রবার্টদের খুঁজে পেলে তো ওঁর কীর্তি ফাঁস হয়ে যাবে। তাই উনি আমাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য জিদ ধরলেন আর মনে মনে মতলব আঁটতে লাগলেন। আমরা রবার্টদের খুঁজে পেলাম। তারপর আবার সবাই যখন পাতালপুরী দেখতে চাইলাম তখন মিঃ চার্লস ভাবলেন এ এক মস্ত সুযোগ। উনিও আমাদের সঙ্গে চললেন এবং কায়দা করে সবার শেষে রইলেন। তারপর আমাদের অলক্ষে পালিয়ে গেলেন দড়ি নিয়ে। ওখান থেকে আমরা যে কোনদিন বেরিয়ে আসতে পারব এ কথা নিশ্চয় আশা করেন নি উনি– তাই না মিঃ চার্লস? একটানা কথা বলে থামলেন চন্দ্রনাথবাবু।

চন্দ্রনাথবাবু শেষের কথায় মিঃ চার্লস ঘাড় ঘুরিয়ে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন ওঁর দিকে। মনে হ'ল এক্ষুনি যেন লাফিয়ে পড়বেন উনি চন্দ্রনাথবাবুর উপরে।

রবার্ট মিঃ চার্লসের হাবভাব লক্ষ্য করে বলে উঠল, মিঃ চার্লস অনর্থক উত্তেজিত হবেন না। উত্তেজিত হবে আপনার বুকের চেহারাটা বড় বিশ্রী হয়ে ওঠে। তার থেকে আসুন বাজনা শোনা যাক।' বলে পাশের চেম্বার থেকে টেপরেকর্ডার নিয়ে এসে চালিয়ে দিল ও।

অদ্ভুত সুরেলা একটা মিষ্টি বাজনার সুরে ভরে উঠল কন্ট্রোলরুম। মিঃ চার্লস ছাড়া সবাই এক মনে বাজনা শুনতে লাগল। মিঃ চার্লসের মাথার মধ্যে তখন একটা কূটিল চিন্তা পাক খাচ্ছে। কন্ট্রোল-প্যানেলের সুইচগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলেন উনি নিজের মনে।

ওঁর মনের মধ্যে যে ভয়ঙ্কর চিন্তাটা ঘুরপাক খাচ্ছে তার সামান্যতম আভাসও কেউ বুঝতে পারছে না বাইরের থেকে। মাহকাশের বুক চিরে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলেছে 'উল্কা'। টেপ রেকর্ডারে বেজে চলেছে একটা মিষ্টি সুর।

[সমাপ্ত]

আগামী সংখ্যা থেকে

অদ্রীশ বর্ধনের

ধারাবাহিক উপন্যাস

নরবানরের গ্রহে

শুরু হচ্ছে।

চেনা-অচেনা উদ্ভিদ

পান্থপাদপ

এণাক্ষী বিশ্বাস

এবার যে উদ্ভিদটির কথা বলব তার নাম পান্থপাদপ। পান্থ কথার অর্থ পথিক আর পাদপের অর্থ যে পাদদ্বারা পান করে। অর্থাৎ পথিক যে পাদদ্বারা জল পান করে, তার নাম পান্থপাদপ।

বহুকাল আগের কথা। যখন এখনকার মতো সভ্যতার বিকাশ হয়নি, পায়ে হাঁটা পথে মানুষকে চলতে হত। জঙ্গলাকীর্ণ পথে পথিক তৃষ্ণার্ত হয়ে কোনো ধারাল কিছু দিয়ে এই উদ্ভিদটির পত্রবৃন্তের গোড়ায় চাপ দিলে কলের জলের মতো জল বার হয়ে আসে। এই জল দিয়ে পথিক তার তৃষ্ণা নিবারণ করত। এ থেকেই এই উদ্ভিদটির নাম পান্থপাদপ হয়েছে। ইংরাজীতে ট্র্যাভেলার্স ট্রী বলা হয়।

পান্থপাদপ দেখতে বৃক্ষ হলেও, এটি বিশালাকার বহুবর্ষজীবী বীরুৎ। উচ্চতায় প্রায় 30 মিটার হয়। কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ুতে এর উচ্চতা প্রায় অর্ধেক হয়।

এই উদ্ভিদটির আদিনিবাস মাদাগাস্কার। বৈজ্ঞানিক নাম র‍্যাভেনেলা মাদাগাস্কারিয়েনসিস। মিউসেসী গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। মাদাগাস্কারের অধিবাসীরা এই উদ্ভিদটিকে র‍্যাভেনেলা বলে।

এই উদ্ভিদটির শিশু অবস্থায় কান্ড বার হয় না। কলাপাতার মতো দেখতে পাতাগুলি পরপর এমন সুন্দরভাবে সাজানো থাকে যে চালচিত্রের মতো দেখতে লাগে। সেজন্য অনেকে বাগান সাজানোর জন্য এই গাছ লাগিয়ে থাকেন। কচি অবস্থায় পাতাগুলি আস্ত থাকে কিন্তু ধীরে ধীরে বাতাসের তীব্রতায় পাতাগুলি ফেটে যায়। লম্বা পত্রবৃন্তের পাদপ্রান্ত অবতল হয় এবং পত্রবৃন্তের পাদপ্রান্তের কিছুটা অংশ ঢেকে পরবর্তী পত্রটি বিস্তৃত হয়। পত্রবৃন্তের পত্র কোষের মধ্যে জল সঞ্চিত থাকে। পান্থপাদপের ছবিটিতে গাছের কান্ডের ওপর পাতাগুলি বিন্যস্ত রয়েছে। কান্ডটি দেখতে অনেকটা তালগাছের মতো।

ফুলের কথায় বলি, ঘন মঞ্জরী হয়। প্রত্যেকটির নিজস্ব ছোট বৃন্ত থাকে এবং মঞ্জরীপত্র দিয়ে ঢাকা থাকে। ফুলে তিনটি অসমান বৃতি, তিনটি অসমান পাপড়ি, পাঁচটি পুংস্তবক এবং একটি গর্ভস্তবক থাকে।

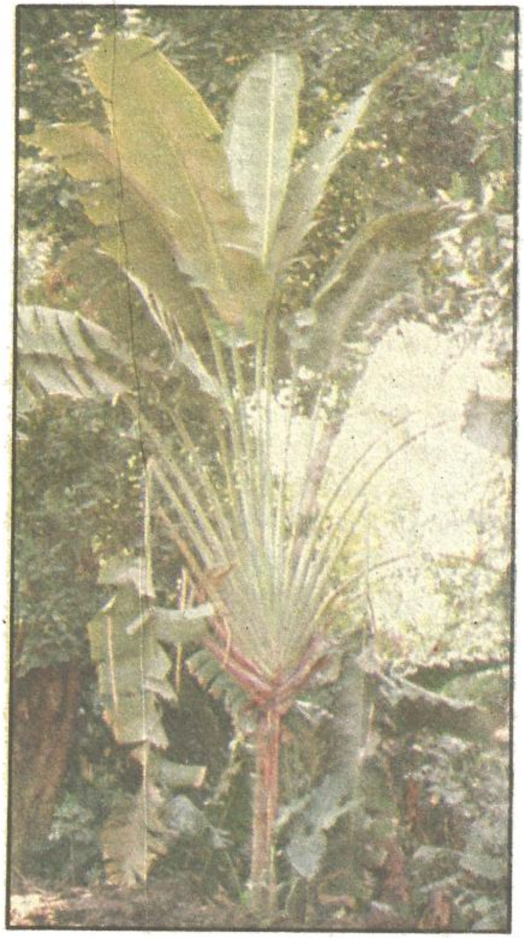

ফল তিনকোণা ক্যাপসুল। ফলের ভেতর প্রচুর বীজ, লাল রঙের তন্তু দ্বারা পরিবেষ্টিত।

বর্ষার পর গাছে ফুল আসে কিন্তু ফল পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ুতে সাধারণতঃ হয় না।

মাদাগাস্কারে এই বীজ খায় এবং এর মধ্যে গ্রহণযোগ্য তেল পাওয়া যায়।

এই পান্থপাদপ গাছ অনেক জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। দক্ষিণেশ্বরে ৺শ্রীমায়ের মন্দিরের সামনে দুটি গাছ আছে। যেগুলির এখনও কান্ড বের হয় নি। আলিপুর এগ্রি-হর্টিকালচার উদ্যানে, রাজভবনে, শিবপুরে ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে, কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে, অনেকের বাড়ির বাগানে ও আরও অনেক জায়গায় এই পান্থপাদের দেখা মিলবে।

ছবি : সুবলকৃষ্ণ দে

কোয়ার্জ অমরনাথ রায়

বিভিন্ন শিলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে যে মণিকটি পাওয়া যায় তা 'কোয়ার্জ' নামে পরিচিত। কোয়ার্জের রাসায়নিক সংকেত হলো SiO_2, অর্থাৎ কিনা 'সিলিকন—ডাই অক্সাইড।' এই মণিকটির কেলাস সাধারণত ষড়ভুজাকৃতি প্রিজমের মতো এবং দুটি প্রান্ত ষড়তল পিরামিডাকৃতি। কোয়ার্জকে কখনও কখনও অকেলাসিত অবস্থায়ও পাওয়া যায়। মোজ (Moh's) স্কেলে এর কাঠিন্য 7

কোয়ার্জ সাধারণত বর্ণহীন, তবে গোলাপী, নীল ও ধূসর রঙেরও হয়। মণিকটি স্বচ্ছ, তবে কখনও কখনও আধাস্বচ্ছ এবং মোমের বা কাচের মতো দ্যুতিযুক্ত হয়। এর আপেক্ষিক গুরুত্ব 2·6 থেকে 2·65-এর মধ্যে হয়। এই মণিকটির অপর বিশেষত্ব হলো এর 'বহুরূপতা।' এর রূপভেদগুলি আলফা-কোয়ার্জ, বিটা-কোয়ার্জ, ট্রাই-ডিমাইট, ক্রিস্টোব্যালাইট ইত্যাদি নামে পরিচিত। কোয়ার্জ এর অপর উল্লেখযোগ্য ধর্ম হলো 'পিজোইলেকট্রিসিটি' অর্থাৎ বলপ্রয়োগে বিকৃত করলে এর কেলাসের দুটি বিপরীত প্রান্তে যথাক্রমে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িতের আবেশ ঘটে। মণিকটি পাইরোইলেকট্রিকও বটে। তার মানে, তাপ প্রয়োগে কোয়ার্জ কেলাসের বিভিন্ন অংশে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িৎ আবিষ্ট হয়। সমস্ত ধর্ম

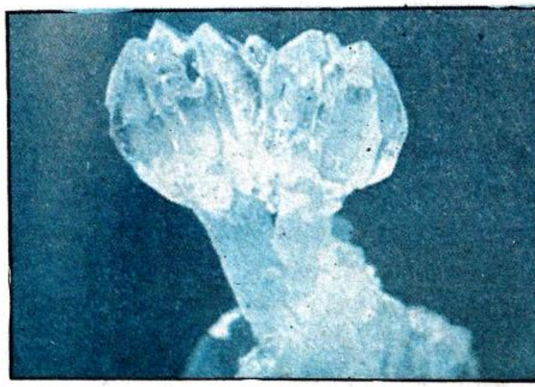

থাকায় কোয়ার্জকে রেডিও ট্রান্সমিটার, সোনার, রাডার প্রভৃতি যন্ত্রে ব্যবহার করা যায়। বিশ্বের যে সব দেশে কোয়ার্জ-এর উল্লেখযোগ্য ভাঁড়ার আছে তার মধ্যে আমেরিকা কানাডা, মেক্সিকো, ব্রাজিল, স্কটল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড ও জার্মানী অন্যতম। আমাদের ভারতবর্ষেও বিভিন্ন ধরনের শিলা থেকে প্রচুর পরিমাণে কোয়ার্জ পাওয়া যায় এবং তা বিভিন্ন শিল্পকাজে ব্যবহৃতও হয়।

আগামী সংখ্যা থেকে
ধারাবাহিক উপন্যাস

নরবানরের গ্রহে
অদ্রীশ বর্ধন

ঢং ঢং করে বারোটার ঘণ্টা বাজল। অমনি ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ল সিণ্ডাবেলা, নিমেষের মধ্যে ঘোড়ার গাড়িটা কুমড়ো হয়ে যাবে। ঘোড়াগুলো ইদুঁর আর সহিসগুলো টিকটিকি।

'ইস, ঘড়িটারই বা অমন ঢং ঢং করে বাজবার দরকার কি বল তো? জিজা বললে খুব সমব্যথীর মতো। আসলে এই ঘড়ির ঢং ঢং-টা ওর একেবারে পছন্দ নয়। বিশেষ করে এই সময়। রোজ খাওয়া-দাওয়ার পর এই সময়টা ও আমার কাছে গল্প শুনতে আসে। নটা অবধি বরাদ্দ। তার পরেই শুতে যাবার ডাক আসে। তাই নটার ঘণ্টাটা ও একেবারেই পছন্দ করে না।

ঘড়ি আবিষ্কার

'সত্যিই ঘড়িগুলো এরকম করে বাজে কেন বলতো কাকু?' জিজা আবার বললে।

'তাহলে, তো ঘড়ির গল্প শুনতে হয়।

'বল।'

'আর সিণ্ডারেলা?'

'কাল শুনবখন।'

ঘড়ির নিয়ম প্রথম আবিষ্কার করেন গ্যালিলিও। কমবয়সে যখন ডাক্তারি পড়ছেন গ্যালিলিও, দেখলেন পিসার এক গির্জায় একটা ল্যাম্প দুলছে। নিজের নাড়ী টিপে মিলিয়ে দেখলেন, যে এই দোলার গতির একটা ছন্দ আছে। তাহলে, ভাবলেন তিনি, এই দোলার গতির থেকে সময়ের একটা হিসেব পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু 1656-এ খ্রীস্তিয়ান হিউজেনস নামে একজন ওলন্দাজ বৈজ্ঞানিক এই নিয়ম থেকে পেণ্ডুলাম ঘড়ি আবিষ্কার করলেন।

ঘড়ি আবিষ্কারের আগে মানুষ সময় দেখত বালির ঘড়ি থেকে। কাঁচের দুটো পাত্র জোড়া থাকত, তাতে থাকত বালি ভরা। একদিক থেকে সমস্ত বালি অন্যদিকে যখন চলে যেত—বোঝা যেত যে একটা নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেছে।

এছাড়া ছিল সূর্য ঘড়ি। গোল একটা চাকতিতে দাগ কাটা থাকত ঘড়ির মতো। সূর্য যত পূর্ব থেকে পশ্চিমে হেলে পড়ত, তার ছায়া তত সরে যেত চাকতির ওপর থেকে।

তারপর এল পেণ্ডুলাম ঘড়ি। এই পেণ্ডুলামটা হলো যেটা সবসময় সময়ের সাথে দুলছে ঘড়ির মধ্যে।

ঢং ঢং ঢং—নটা বাজল। জিজার মুখ অমনি পাংশু। আস্তে আস্তে শোবার ঘরের দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে বলল, 'গুড নাইট, কাকু।'

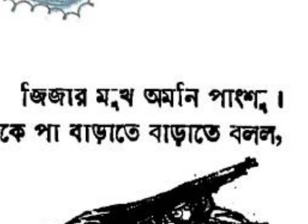

অলয় ঘোষাল ও ঋতুপর্ণ ঘোষ

জুনিয়ার ক্যুইজ কনটেস্ট

June 1986

মান : VI/VII/VIII শ্রেণী

1. ময়ূরের পুচ্ছপালক ক'টি ?
2. কচুরীপানা গাছে কোনো ফল হয় কি ?
3. পারসিকদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের নাম কি ?
4. ইউরোপের আদিকবি বলা হয় কাকে ?
5. 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন কে ?
6. খ্যাতনামা অধ্যাপক দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান-এর পূর্ব নাম কি ছিল ?

সূর্য হতে পৃথিবীতে কোন পদ্ধতিতে তাপ আসে ?

7. 'থিম্পু' কোন দেশের রাজধানী ?
8.
9. 'জুজুৎসু' কোন দেশের জাতীয় ক্রীড়া ?
10. বোম্বাইতে অবস্থিত 'টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ" নামক গবেষণা সংস্থাটি কে প্রতিষ্ঠা করেন ?

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প

লীলা মজুমদার ॥ কল্পবিজ্ঞানের গল্প ১৫

ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য ॥ লুপ্তধন ৮

ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য ॥ মেঘনাদ ১০

অদ্রীশ বর্ধন ॥ কিশোর সায়েন্স ফিকশন ১৫

ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য

তুষারলোকের রহস্য ৮

কারিগরী বিদ্যার প্রথম পাঠ

সহজ সরল ব্যাখ্যাসহ প্রায় অর্দ্ধশত মডেলের সচিত্র নির্মাণ প্রণালী

জয়ন্ত দত্ত সঙ্কলিত

নিজে নিজে কর ১০

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান : শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ

৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড • কলকাতা ৯

ফোটো ক্যুইজ

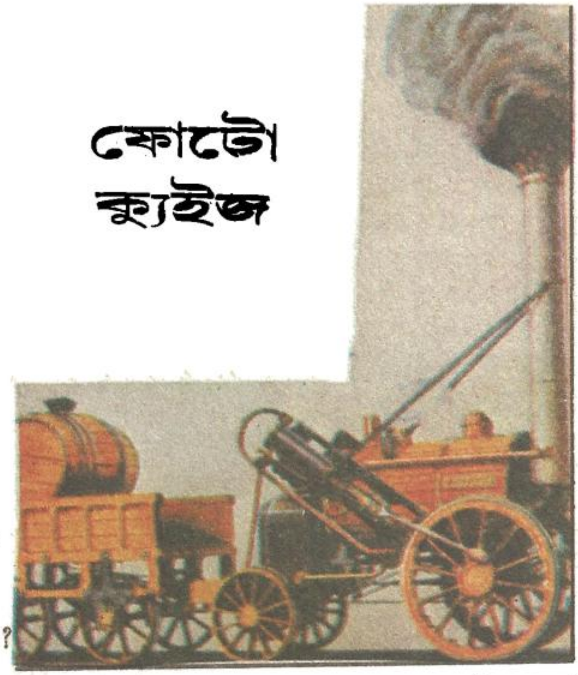

এই স্টীম ইঞ্জিনের নাম কি ? এর আবিষ্কর্তাই বা কে ?

হ্রদের ধারে বিরাট বিরাট ডানাওয়ালা ঐ যন্ত্র দুটির নাম কি ?

অভিস্রবণ

দিনোজকুমার দে

একটি রুই মাছকে যদি সমুদ্রের জলে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে কি ঘটবে জান? মাছটি মরে যাবে। কিন্তু মাছটির মরার কারণ কি? রুইমাছ মিঠা জলের মাছ। মিঠা জলের অভিস্রবণ গাঢ়ত্ব সমুদ্রের জলের অভিস্রবণ গাঢ়ত্ব অপেক্ষা অনেক কম। তাই মিঠা জলের মাছকে সমুদ্রের জলে রাখলে মিঠা জলের মাছের দেহ থেকে জল বহিঃঅভিস্রবণ পদ্ধতিতে বের হয়ে যাবে। ফলস্বরূপ মিঠা জলের মাছের সমস্ত সজীব কোষের প্রোটোপ্লাজমের সংকোচন হবে। অবশেষে মাছটি শুষ্ক হয়ে মরে যাবে। রুই মাছের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া ঘটবে এবং রুই মাছটিও মারা যাবে। স্বভাবতই মনে আসে বহিঃঅভিস্রবণ কি? তার আগে তোমাদের জানা উচিত অভিস্রবণ কি? অভিস্রবণ একটি ভৌত প্রক্রিয়া। অর্থাৎ দুটি সমপ্রকৃতির কিন্তু ভিন্ন গাঢ়ত্বের দ্রবণকে যদি একটি অর্ধভেদ্য পর্দা দ্বারা পৃথক করে রাখা যায় তাহলে বেশি গাঢ়ত্ব দ্রবণের দ্রাবক অণুগুলি অর্ধভেদ্য-পর্দা ভেদ করে কম গাঢ়ত্ব দ্রবণের মধ্যে এসে উভয় দ্রবণের গাঢ়ত্ব সমান করে। অর্ধভেদ্য-পর্দা ভেদ করে দ্রাবক অণুর এই যাতায়াতকে বলে অভিস্রবণ। কম গাঢ়ত্ব দ্রবণের দ্রাবক অণুগুলি যদি বেশি গাঢ়ত্ব দ্রবণের দিকে যায় তবে সেই প্রক্রিয়াকে বলে অন্তঃঅভিস্রবণ। আর বেশি গাঢ়ত্ব দ্রবণের দ্রাবক অণুগুলি যদি কম গাঢ়ত্ব দ্রবণের দিকে যায় তবে সেই প্রক্রিয়াকে বলে বহিঃঅভিস্রবণ।

ব্যাপন প্রক্রিয়াতেও বেশি ঘনত্বের গ্যাসের অণুগুলি কম ঘনত্ব গ্যাসের দিকে যায়। অভিস্রবণেও দেখ, বেশি-ঘনত্বের দ্রবণের দ্রাবক অণুগুলি কম ঘনত্ব দ্রবণের দিকে যায়। তাহলে কি ব্যাপন ও অভিস্রবণ একই প্রক্রিয়া? না তা নয়। ব্যাপনে অর্ধভেদ্য-পর্দার প্রয়োজন হয় না কিন্তু অভিস্রবণে অর্ধভেদ্য-পর্দার প্রয়োজন। অর্ধভেদ্য-পর্দা হচ্ছে যে পর্দার মধ্য দিয়ে কেবলমাত্র দ্রবণের দ্রাবক অণুগুলি যাতায়াত করতে পারে। প্রকৃত অর্ধভেদ্য-পর্দার উদাহরণ পার্চমেণ্ট কাগজ। কোষ পর্দাকেও অর্ধভেদ্য পর্দা হিসাবে ব্যবহার করা হয় কিন্তু কোষপর্দা প্রকৃতপক্ষে অর্ধভেদ্য-নয়। কারণ কোষ পর্দার মধ্য দিয়ে অল্প পরিমাণ দ্রাবের অণুগুলি যাতায়াত করতে পারে।

অন্তঃঅভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় কোষ জল শোষণ করে। শোষিত জল কোষ পর্দার উপর এক প্রকার চাপের সৃষ্টি করে। এই চাপকে বলে জলস্ফীতি চাপ। জলস্ফীতি চাপ সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছলে অন্তঃঅভিস্রবণ বন্ধ হয়ে যায়। এরকম অবস্থায় কোষের চাপকে বলে অভিস্রবণ চাপ। জীবদেহের প্রতিটি কোষের গাঢ়ত্ব সমান হয় না। গাঢ়ত্ব সমান না হওয়ার জন্য একটি কোষ থেকে পরবর্তী কোষে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় জল যেতে পারে। এইভাবে অভিস্রবণের দ্বারা একটি কোষ থেকে আর একটি কোষে জল যাওয়ার প্রক্রিয়াকে বলে কোষান্তর অভিস্রবণ। অভিস্রবণ সম্বন্ধে তোমাদের পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে হলে বিভিন্ন প্রকার দ্রবণ সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা থাকা প্রয়োজন। ঘনত্ব ভেদে দ্রবণকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। তিন প্রকার দ্রবণ হল (a) লঘুসারক (b) সমসারক ও (c) অতিসারক। যদি পরিবেশের দ্রবণের ঘনত্ব কোষরসের ঘনত্ব অপেক্ষা কম হয় তাহলে পরিবেশের দ্রবণকে বলা হয় লঘুসারক দ্রবণ। আর যদি পরিবেশের দ্রবণের ঘনত্ব এবং কোষরসের ঘনত্ব সমান হয় তবে তাকে বলে সমসারক দ্রবণ। কিন্তু যদি পরিবেশের দ্রবণের ঘনত্ব কোষ রসের ঘনত্ব অপেক্ষা বেশি হয় তাহলে তাকে বলে অতিসারক দ্রবণ। আবার সেই রুই মাছের কথায় আসা থাক। রুই মাছের কোষরস সমুদ্রের জল অপেক্ষা অতিসারক। অর্থাৎ সমুদ্রের জল রুইমাছের কলারস অপেক্ষা অতিসারক। ফলে বহিঃঅভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় রুইমাছের দেহ থেকে জল বের হয়ে প্রোটোপ্লাজমের সংকোচন হবে এবং মাছটি মরে যাবে।

উদ্ভিদের জীবনে অভিস্রবণের গুরুত্ব অনেকখানি। উদ্ভিদ মাটি থেকে যে জল ও জলে দ্রবীভূত খনিজ লবণ শোষণ করে তার মূলে কিন্তু অভিস্রবণ। এই অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জল জাইলেম বাহিকা থেকে অন্যান্য সজীব কোষে প্রবেশ করে। উদ্ভিদের বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে অভিস্রবণ। কারণ অভিস্রবণের ফলে কোষের রসস্ফীতি ঘটে। আর রসস্ফীতি ভাজক-কলার বৃদ্ধি ঘটায়। অভিস্রবণে সৃষ্ট রসস্ফীতি পত্ররন্ধ্রের রক্ষীকোষকে পরিচালনা করে অর্থাৎ পত্ররন্ধ্র নিয়ন্ত্রিত হয়। এই রসস্ফীতিই উদ্ভিদের পাতাকে প্রসারিত হতে সাহায্য করে এবং বিভিন্ন অঙ্গকে খাড়া রাখতে সাহায্য—করে। উদ্ভিদের ট্রপিক ও ন্যাস্টিক চলনেও অভিস্রবণের ভূমিকা আছে। এমনকি এই অভিস্রবণই পরোক্ষভাবে ফুলের রেণু ও ফলের বিস্তার ঘটিয়ে বংশবৃদ্ধিতে সাহায্য করে। প্রাণীদের জীবনেও অভিস্রবণের গুরুত্ব আছে। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবে। অ্যামিবা মিষ্টি জলের প্রাণী। অ্যামিবার কোষের দ্রবণ মিষ্টি-জল অপেক্ষা অতিসারক। তাই অন্তঃঅভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় অ্যামিবার দেহে জল প্রবেশ করে। এই অতিরিক্ত জল সংকোচনশীল গহ্বরের মাধ্যমে দেহের বাইরে বেরিয়ে যায়।

পদার্থ বিজ্ঞানের কথা

অজয় চক্রবর্তী

নিউটনের তৃতীয় সূত্র সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার আগে বলে রাখি যে, দ্বিতীয় গতিসূত্রটি থেকেই নিউটনের প্রথম গতিসূত্রটি পাওয়া যায়। একটু চিন্তা করলেই তোমরা তা বুঝতে পারবে। দ্বিতীয় গতিসূত্র থেকে আমরা জেনেছি যে, কোন বস্তুর ত্বরণ ঐ বস্তুর ওপর ক্রিয়াশীল বলের সমানুপাতিক। বলের মান শূন্য হলে, অর্থাৎ বস্তুটির ওপর কোন বল ক্রিয়া না করলে, বস্তুটির ত্বরণও শূন্য হবে। বেগের মান এবং অভিমুখ অপরিবর্তিত থাকলে তবেই ত্বরণের মান শূন্য হয়। কাজেই, কোন বস্তুর ওপর বল ক্রিয়া না করলে বস্তুটি সমবেগে সরলরেখা বরাবর চলবে। নিউটনের প্রথম গতিসূত্রটিও এ কথাই বলে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রের মধ্যেই তাঁর প্রথম গতিসূত্রটি নিহিত আছে। দ্বিতীয় সূত্রটির অনুসিদ্ধান্ত হিসেবেই আমরা প্রথম সূত্রটি পেয়ে যাই।

প্রথম এবং দ্বিতীয় গতিসূত্র একটি বস্তুর ওপর বলের ক্রিয়া নির্দেশ করে। কিন্তু তৃতীয় সূত্রটিতে একটি বস্তু নয়, দুটো বস্তুর উল্লেখ থাকে। এক বস্তু যেমন অন্য বস্তুকে ঠেলে বা টানে তখন দ্বিতীয় বস্তুটিও প্রথম বস্তুটির ওপর সমান ও বিপরীতমুখী বলপ্রয়োগ করে তাকে ঠেলে বা টানে। বাস্তবে বল কখনো নিঃসঙ্গভাবে ক্রিয়া করে না। বল থাকলেই তার প্রতিক্রিয়া থাকবে এবং সে-প্রতিক্রিয়া হবে বলেরই সমান এবং বিপরীতমুখী। মনুষ্যসমাজে ইটের বদলে পাটকেল, কিংবা নাকের বদলে নরুনের প্রচলন আছে, কিন্তু বস্তুতে বস্তুতে পারস্পরিক বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে তেমনটি চলে না। এখানে একের বল অন্যের বলের সমান না হয়ে পারে না।

কোন বস্তুতে সমান এবং বিপরীতমুখী দুটো বল ক্রিয়া করলে বস্তুটির ওপর ক্রিয়াশীল মোট অসম বল শূন্য হয়। এমন হলে বস্তুতে ত্বরণ সৃষ্টি হতে পারে না। এখন, যে-কোন দুটো বস্তুর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সমান এবং বিপরীতমুখী বলে মনে হতে পারে যে, এরা পরস্পরকে নাকচ করে দেবে। কিন্তু ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া বল যদি পরস্পরকে নাকচ করে দিত তবে বল প্রয়োগ করে কখনো কোন বস্তুতে ত্বরণ সৃষ্টি করা যেত না, বলপ্রয়োগ করে স্থির বস্তুকে সচল করা যেত না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া পরস্পর সমান এবং বিপরীতমুখী হলেও এরা পরস্পরের প্রভাবকে নাকচ করে দিতে পারে না। এর কারণ হলো এই যে, ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া দুটো ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ওপর ক্রিয়া করে। রাইফেল থেকে যখন গুলি ছোঁড়া হয় তখন রাইফেল বুলেটকে সামনের দিকে ঠেলে দেয়। সেই সময় বুলেটও রাইফেলকে একই বলে পেছন দিকে ঠেলে দেয়। তাই গুলি ছোঁড়ার সময় রাইফেলধারী পেছন দিকে ধাক্কা খায়।

ঘোড়া যখন গাড়ি টানে তখন গাড়িও ঘোড়াকে টানে। এক্ষেত্রে ঘোড়া গাড়িকে টানে সামনের দিকে আর গাড়ি ঘোড়াকে টানে পেছন দিকে। কাজেই, ঘোড়ার টানে গাড়ি যখন সামনের দিকে যায় তখন গাড়ির টানে ঘোড়ার যাবার কথা পেছন দিকে। কিন্তু ঘোড়া কি সত্যি পেছন দিকে যায়? না। আমরা দেখি, ঘোড়া আর গাড়ি—দুইই চলছে সামনের দিকে। এটা কেমন করে সম্ভব হয়?

এ ঘটনা ব্যাখ্যা করার আগে আমরা পদার্থ বিজ্ঞানের আর একটি সংরক্ষণ সূত্রের উল্লেখ করব। সেটা হলো রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র। আমরা ভরের সংরক্ষণ সূত্র নিয়ে আলোচনা করেছি, আলোচনা করেছি শক্তির সংরক্ষণ সূত্র নিয়ে। এবার দেখব যে, বিশেষ ক্ষেত্রে একটি বস্তু-সংহতির রৈখিক ভরবেগও অপরিবর্তিত থাকে। নিউটনের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সূত্র থেকেই রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্রটিতে উপনীত হওয়া যায়। অর্থাৎ, নিউটনের ঐ সূত্র দুটোতেই আলোচ্য সংরক্ষণ সূত্রটি নিহিত আছে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, পদার্থবিদেরা সংরক্ষণ সূত্র খুঁজে বের করতে পারলে খুশি হন, যেমন খুশি হন কবিরা যুৎসই কোন উপমা কিম্বা চমকপ্রদ কোন রূপকল্প খুঁজে পেলে। [ক্রমশঃ]

38 পৃষ্ঠার পর

ওপর একটু বেশি অত্যাচার করছেন না কি আপনারা ? এ ঘরে আসতে কে আপনাদের অনুমতি দিয়েছে ?'

'কেউ দেয়নি, এখন বলুন এখানে হচ্ছে কি ?'

মিঃ নিশিমারা অদ্ভুত ভাবে হেসে বললেন, 'যা হচ্ছে তা'ত দেখতেই পাচ্ছেন ! এ লোকটাকে সাপে কামড়েছে, তারই চিকিৎসা করছিলাম।' মিঃ মার্টিন তখন মেঝেয় বসে পড়ে তানলিনকেই পরীক্ষা করছিলেন। তিনি মুখ তুলে কঠিন স্বরে বললেন, 'এ ত মারা গেছে। আর সাপেও কামড়ায় নি। বলুন, কি করেছেন একে ?'

'কি করেছি জানতে চান ?' নিশিমারা কখন এরই মধ্যে কোথা থেকে একটা পিস্তল হাতে নিয়েছেন লক্ষ্যই করিনি। সেইটে আমাদের দিকে উঁচিয়ে ধরে তিনি বললেন,—'বেশ, সেই কথাই বলব তাহলে, শুনুন। পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্য আবিস্কারের কথা শুনে মরার সৌভাগ্য আপনাদেরই হোক। আপনাদের তানলিন সাপের কামড়ে মারা যায় নি—মারা গেছে মশার কামড়ে !'

নিশিমারা তীক্ষ্ন উচ্চ অট্টহাস্যে আমাদের স্তম্ভিত করে আবার বলতে লাগলেন,—'বিশ্বাস করতে পারছেন না ব্যাপারটা, কেমন ? কোন ভাবনা নেই, এক্ষুণি প্রত্যক্ষ প্রমাণ আপনাদের দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে বলে যাই, শুনুন। মশার লালার রাসায়নিক পরিবর্তনের কথা যা বলেছিলাম মনে আছে ত। সে পরিবর্তন আমি সত্যিই করেছি। ডিম থেকে শুরু করে মশা যখন সামান্য জলের পোকা হয়ে থাকে, তখন পর্যন্ত তার ওপর নানা প্রক্রিয়া চালিয়ে মশার লালার এমন রাসায়নিক পরিবর্তন আমি ঘটিয়েছি যে, সাপের বিষের চেয়েও সে লালা মারাত্মক হয়ে উঠেছে। কাল রাত্রে যে চিৎকার শুনেছিলেন, সে এমনি একজনের ওপর মশার কামড়ের পরীক্ষার ফল। তানলিনের অবস্থা ত সামনেই দেখতে পাচ্ছেন—এইবার আপনাদের পালা।'

নিশিমারার ইঙ্গিতে সেই যমদূত তখন মিঃ মার্টিনকে অবলীলাক্রমে তুলে ধরেছে। তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে নিশিমারা বললেন, 'এই কাঁচের নল দেখছেন, এর ভেতর একটি মাত্র বিষাক্ত মশা ভরা আছে। এই একটি মশা কিন্তু এখনো আপনার মত জন-বিশেক জোয়ানকে অনায়াসে পরপারে পাঠিয়ে দিতে পারে। আপনি বিজ্ঞানের পীঠস্থান, সভ্য মার্কিন মুলুকের লোক। তাই আপনাদের দুই বন্ধুর মধ্যে বিজ্ঞানের পরীক্ষায় প্রাণ দেওয়ার গৌরব আপনাকেই দিতে চাই। বেশী কিছু আপনাকে করতে হবে না। এই নলটি এমন কায়দায় তৈরী যে গায়ে চেপে

'দরজাটা পল্কা, ভেঙ্গে গেছে।' ছুঁচ-এ শয়তান সাবাটিনির কপালে জুটেছে একটা ধোবি পাট আর চরকি পাক। 'ফুটো'-তে গুপ্তচর মিচেল মত্ত হাতীর মত এগিয়ে আবার পরক্ষণেই ঘরের এক কোণের একটা সোফার ওপর ডিগবাজী খেয়ে পড়ে কাতরাতে থাকে।

'দাঁত'-এ বেনিটো প্রথমে 'ঘাড়মুড় গুজে' জাহাজের কেবিনের একধারে পড়ে। শেষে এক রদ্দা খেয়ে আর

শিল্পী ধ্রুব রায়ের চোখে ঘনাদা

ছোট্ট এক থাবড়ায় ঘনাদা কার্ল পাউলোকে চেয়ারের মধ্যে সেঁধিয়ে দিয়েছেন। যে কার্ল পাউলো বেচারা জুয়ান ভার্গিসের গরু ঘোড়ার র‍্যাঞ্চ নানা ষড়যন্ত্র করে হাতিয়ে না নিতে পেরে ঘনাদাকেই হুকুম করেছিল—যে করেই হোক জুয়ান ভার্গিসকে ভিটে ছাড়া করার।

আনন্দ পাবলিশার্সের সৌজন্যে

উঠতে পারে না। 'হাঁস'-এ ফন ক্রুলের ঘাড়ে ছ'ফুট ডুমনী লাশের চাপে একদিকের দড়ি ছিঁড়ে তাঁবুর একটা কোণ ঝুলে পড়ে। তবে 'সুতো'-তে বেনিটোর যুযুৎসু আর সুমো ঘনাদাকে একটু বিপদে ফেলেছিল। তার হাসি মাঝপথে বন্ধ হল বাংলা কাঁচির কল্যাণে। একই উপায়ে

ধরার সঙ্গে সঙ্গে সামনের ঢাকনাটা ভেতর দিকে খুলে যায়,—হিংস্র মশাটাও উড়ে এসে কামড়ে দিতে দেরি করে না—'

সমস্ত মাথার ভেতর কেমন ঝিমঝিম করছিল! মনে হচ্ছিল আর যেন দাঁড়াতে পারব না! কিন্তু তারই মধ্যে হঠাৎ মরিয়া হয়ে সজোরে একটা ঘুষি ছুঁড়লাম। নিশিমারা আচমকা ঘুষি খেয়ে ছিটকে পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাত থেকে কাঁচের নলটা মেঝেয় আছড়ে পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

তারপর যে ব্যাপার ঘটল তা বর্ণনা করা যায় না। কল্পনা কর যে, ভাঙা নল থেকে বেরিয়ে সেই সাক্ষাৎ শমন ঘরের ভেতর উড়ে বেড়াচ্ছে আর তিনটে মানুষ উন্মাদ হয়ে তাকে এড়িয়ে ঘর থেকে পালাবার চেষ্টা করছে—ঘরের মাঝখানে আবার তানুলিনের মৃতদেহ।

কোনরকমে দরজার কাছে পৌঁছে খিলটা খুলে বেরুতে যাব এমন সময় সেই বিশাল কাফ্রী বাঘের মত আমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল।

আর বুঝি আশা নেই! মশাটা ঠিক আমার নাকের কাছে একবার ঘুরে গেল। তার পরেই সেই কাফ্রী এক সঙ্গে পাঁচটা রেলের ইঞ্জিনের মত চীৎকার করে আমার ঘাড়ের ওপর নেতিয়ে পড়ে গেল। বুঝলাম; মশার দংশন-জ্বালার সঙ্গে সব জ্বালা তার জুড়িয়েছে।

কিছু ভাববার আর সময় নেই। উঠে পড়ে আবার পালাতে যাচ্ছি এমন সময় দেখি মিঃ নিশিমারা যুযুৎসুর প্যাঁচে মার্টিনকে চিৎ করে ফেলে দিয়েছেন আর মশাটা ঠিক তার মাথার কাছে উড়ছে। ছুটে গিয়ে হেঁচকা টান দিয়ে মিঃ মার্টিনকে খানিকটা সরিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে নিশিমারার আর্তনাদ শোনা গেল! মশাটা ঠিক তাঁর গালের ওপর গিয়ে বসেছে।

এবার আর একমুহূর্ত দেরি হোল না। আমার প্রচণ্ড এক চাপড় গিয়ে পড়ল নিশিমারার গালে। মশা আর নিশিমারার ভবলীলা এক সঙ্গেই সাঙ্গ হয়ে গেল!

মশা মারবার পরিশ্রমেই যেন হাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঘনাদা বললেন,—'জীবনে তারপর মশা মারতে আর প্রবৃত্তি হয় নি।'

ঘনাদাকে ভোট দিন—এ গোবো কাবু হয়। একটা টেবিল সঙ্গে সঙ্গে মড়মড় করে ওঠে। 'জল'-এ সাদা ঠিকাদার ফিংকের পা দুটো ধরে মাটিতে আছড়ে ফেলে ঘনাদা তার রিভলবার কেড়ে নেন। পরের ডান গালের চড়টা একটু জোরেই হয়েছিল। 'চোখ'-এ হাতুড়ে ডাক্তার চিংসুনের মাংসের পাহাড় 'সচাপ্টে' ছুরি হাতে এক মাল্লার ওপর গিয়ে পড়ে। 'ঘনাদা কুলপি খান না'-তে পেরীন বুনো মোষের মত পেছন থেকে সজোরে ঠেলা দেওয়া সত্ত্বেও শেষে বরফের অতলান্ত ফাটলের পাড়ে ঝুলতে থাকে। 'ঘনাদার ফুঁ'-এর ধাক্কায় স্পেনের সবচেয়ে বড় ঘরানার একটি ষাঁড় মাটি নেয়। 'বেড়াজালে ঘনাদা'-তে দশাসই কার্ল পাউলো এক থাবড়ায় ইজি চেয়ারে চিৎ হয়ে পড়ে। 'মাছি'-তে ক্যাপেলা আসে ঘনাদার গলা টিপে দিতে। তাকে পাওয়া যায় একটা প্লেনের চাকার তলায়। 'টল'-এ ক্যাপ্টেন ডোনাট মরুর বালি উপুড় হয়ে যেন দণ্ডী কাটছেন। 'নাচ'-এ আহারার জুডোতে ঘনাদা সাত হাত দূরে ছিটকে চিতপাত হয়ে পড়েন। কিন্তু ক্যারাটে প্রয়োগের পর আহারাকে পাওয়া যায় গজ দশেক দূরে ধুলোর মধ্যে। 'তেল'-এ ডুগান একটা কাঠের বাক্সের শক্ত মজবুত ডালাটা ভেঙে অর্ধেকটা সেঁধিয়ে যায়। 'মাটি'তে কেনী ভূমিশয্যা নেয় ঘনাদাকে প্রচণ্ড একটা ঠেলা দিতে গিয়ে।' মৌ-কা-সা-বি-স থেকে রসোমালাই তে আক্রমণকারী একটা ক্রেনের হাঁ করা নিচের দাঁড়াটার ওপরে পড়েছে। মৌ-কা-সা-বি-স একবচন না বহুবচন-এ গুণ্ডা ড্যানি 'সচাপ্টে মেঝের ওপর আছড়ে' পড়ে। হাতুড়ি নিয়ে তেড়ে এলে তার স্থান হয় কেবিনের কোণের টেবিলটার ধারে। 'পরাশরে ঘনাদায়' গোয়েন্দাপ্রবর জানান ছদ্মবেশী ঘনাদা কিভাবে 'কালো দানোকে' বাগ মানিয়েছিলেন অ্যারিজোনার এক র‍্যাঞ্চে। 'কাঁটা-তে ঘনাদা চার মূর্তিমানকে বেঁধে ফেলেন তাদের জাহাজেরই ডেকের ওপর। পৃথিবী বাড়ল না কেন? এর উত্তর খোঁজার মধ্যে ছদ্মবেশী নাৎসী মালাঙ্গার মাথা ফাটে। 'গুলই ঘনাদা'য় বন্দুকের গুলিতে এসকলের ছিপের সুতো ছিঁড়ে দেন। এসকল প্রথমে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তারপর বালিতে চিৎ হয়ে থাকে।

প্রকাশিত ঘনাদা গ্রন্থসমূহ

ঘনাদার গল্প ॥ ঘনাদা নিত্য নতুন ॥ আবার ঘনাদা ॥
অদ্বিতীয় ঘনাদা ॥ ঘনাদাকে ভোট দিন
ঘনাদার জুড়ি নেই ॥ মঙ্গল গ্রহে ঘনাদা
যার নাম ঘনাদা ॥ দুনিয়ার ঘনাদা ॥
তেল দেবেন ঘনাদা ॥ ঘনাদার ফুঁ ॥ অফুরন্ত ঘনাদা
ঘনাদা বিচিত্রা ॥ ঘনাদার হিজ্ বিজ্ বিজ্ ॥
ঘনাদা চতুর্মুখ ॥ ঘনাদা তস্য তস্য অমনিবাস ॥
আগ্রা যখন টলমল ॥ দাস হলেন ঘনাদা ॥
সূর্য কাঁদলে সোনা ॥ রবিনসন ক্রুশো মেয়ে ছিলেন ॥
ঘনাদা ও মৌকাসাবিস ॥

ছোটদের দপ্তর

পরিচালনায় ● জয়ন্ত দত্ত

এপ্রিল '86 এর আই-কিউ-টেস্ট-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদানের জন্য (আগে আসার ভিত্তিতে) যে পাঁচজন সার্টিফিকেটের জন্য নির্বাচিত হয়েছে ঃ

1. দেবরত্না সরকার, সি-11, গভঃ হাউসিং এস্টেট, বালটিকুরী, হাওড়া-711402।
2. গৌতম মজুমদার, c/o পি. কে. মজুমদার, ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টার্স, অভয়কানন, বোরহাট, পোঃ নূতনগঞ্জ, বর্ধমান-713104.
3. জয়দীপ দাস, প্রযত্নে, চন্দন সুরভী দাস, অফিস অব এ্যাসিস্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার (এগ্রি. মেক.), কন্টাই মেদিনীপুর।
4. শ্রীদাম সরকার, প্রযত্নে, বৈকুণ্ঠ সরকার, গ্রাম ঃ মিলন নগর, ডাক : বগুলা, জেলা : নদীয়া পিন-741502 ।
5. শান্তনু দাস, প্রযত্নে, আর. এন. দাস, গ্রাম ঃ সুদর্শনপুর, ডাক ঃ রায়গঞ্জ. জেলা ঃ পশ্চিম দিনাজপুর।

এপ্রিল '86 সংখ্যার ক্যুইজ-কনটেস্ট-এর কমপক্ষে দশটির সঠিক উত্তরও কেউ দিতে পারো নি। তাই কারোর নাম প্রকাশ করা সম্ভব হলো না।

● আই-কিউ-টেস্ট-এর উত্তরের সঙ্গে অনেকেই নির্দেশ অনুযায়ী কেটে পাঠাচ্ছ না। তাই অনেকের উত্তরপত্রই বিবেচনা করা সম্ভব হচ্ছে না। একটা কুপনেই সবগুলি প্রতিযোগিতার উত্তর পাঠানো যাবে।

আই-কিউ টেস্ট
জুন—1986

1. উদীয়মানে (ascending) সাজাও ঃ
(a) ত্রিভুজ, (b) রেখা, (c) কোণ, (d) আয়তক্ষেত্র, (e) বিন্দু।

2. একদিন তুমি আয়নার ভেতর দিয়ে দেওয়াল ঘড়িটায় দেখলে 9টা বাজতে 15 মিনিট বাকি আছে। তখন প্রকৃত সময় কত ছিল ?
(a) 9-15, (b) 3-15, (c) 1-15, (d) 9-45।

3. প্রথম কলামের সঙ্গে দ্বিতীয় কলামটিকে সঠিকভাবে সংযুক্ত কর ঃ

(a) আকবর	(a) ইয়ংবেঙ্গল
(b) স্যার জোসেফ সোয়ান	(b) বাবুল চেম্বার
(c) নেপোলিয়ন	(c) বুলন্দ দরওয়াজা
(d) হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও	(d) ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস
(e) ডোনাল্ড আর্থার গ্লেজার	(e) কৃত্রিম সিল্ক
(f) র‍্যামজে	(f) জুডো
(g) লর্ড কর্নওয়ালিশ	(g) সেণ্ট হেলেনা
(h) ডঃ জিগারো কানো	(h) নিয়ন গ্যাস

4. একটি পূর্ণসংখ্যার এককের ঘরে 1 থেকে 9 পর্যন্ত যে সংখ্যাগুলি থাকতে পারে, তা হল ঃ
(a) 1, 4, 5, 7, 9 (b) 1, 3, 5, 7, 9
(c) 1, 4, 5, 6, 9 (d) 1, 4, 6, 8, 9

5: 'সোনালী হনুমান' ভারতের কোন প্রদেশে পাওয়া যায় ? (a) কেরল, (b) মধ্যপ্রদেশ, (c) হরিয়ানা, (d) আসাম।

মে সংখ্যার শব্দকূটের সমাধান

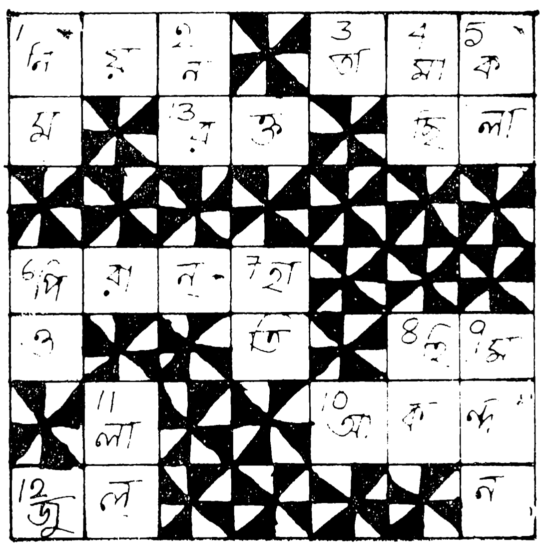

শতঘরী ঘনাদা কূট / আশিস মান্না

1 ব	2 ন	মা	লী	ন	3 স	4 স্ক	5 র	লে	ন
6 ব								7	
শা	শ্র	না	স্ত্রী	9					10
11 দ্বী						12	13	14	
15	16 তা	17	18			19			
20	ট								
21				22			23		
24	25	26 শিশু		27			28		
29		30		31			32 ক্ষা		
33 প্রে	মে	34 ন্দ্র					টি	35	

পাশাপাশি ঃ

1. এই বিখ্যাত গলিতে ঘনাদার বাস (10)
6. 'মাট্রু'-র উড়ন্ত চাকী দেখে ঘনাদা বাইবেলের নৌকার কথা মনে করেন (5)
7. ঘণ্টায় 817 মাইল যায় যে প্রাণী (2)
8. যাঁকে নিয়ে এই 'কূট' (3)
11. 'জিন সেঙ'-এর বদলী (4)
13. 'চোখন' যে অঞ্চলের অধিবাসীদের অন্যতম প্রিয় খাদ্য (3)
15. 'টুপি'-র সেই পর্যটক (3)
20. স্যাভেজ সাহেবের জাহাজ (2)
21. সবচেয়ে দামী ভেড়া (4)
22. দশ গুণ আঠালো জল (2)
23. যে মাছ ভূমিকম্প জানায় (2)
24. যে গল্পে 'সিস্টোসার্কা গ্রিগোরিয়া' আছে (2)
26. ঘনাদার 'মেস মেট' (2)
27. ঘনাদা যাকে 'হোয়েল' ছেড়ে 'হো-হো-বা' ধরতে উপদেশ দেন (2)
28. ইয়েতিদের খাদ্য যার শেকড় (2)
29. 'রেনে লাভাল' কোন গল্পে ? (2)
30. 'কার্টোগ্রাফার স্নুস্তেল'-কে জানতে হলে এ গল্প পড়তেই হবে (2)
31. বিখ্যাত আরব ভূগোলবিদ (6)
33. যার জবানীতে ঘনাদার গল্প (3)
34. শিবুর কাল্পনিক জন্মস্থান (3)
35. হাইতি দ্বীপের জাদু (2)

উপর-নিচ ঃ

1. ঘনাদাদের মেসের কর্মচারী (4)
2. ঘনাদা 'নূতন'-কে যা বলেন (2)
3. সাগর তোলপাড় [উল্টো] (6)
4. সবচেয়ে বড় শকুন (3)
5. 'সিস্টোসার্কা গ্রিগোরিয়া'-র নিয়ন্ত্রক (6)
7. ভূমিকম্পে মরতে বসেন যে গল্পে (2)
9. ছায়াপথের বাইরের ঢিল (5)
10. তেজস্ক্রিয়তা মাপার যন্ত্র (7)
12. ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রস্থল [উল্টো] (2)
14. 'স্ট্রোগানিনা' প্রিয়খাদ্য যাদের (4)
16. 'আহারা' চিঠি দিয়েছিল যে গল্পে (2)
17. 'যাঁর নাম ঘনাদা'-র শেষ গল্প (2)
18. 1175 জনকে যে ঘূর্ণিঝড় মারে (3)
19. 'বিশ্ব জননীর পূত সলিল' (6)
25. 'ঘনাদার গল্প'-এর একটি গল্প (2)
26. যার কাছ থেকে ঘনাদা সিগারেট 'ধার' নিতেন (3)
32. ঘনাদার ব্যবহৃত মারামারির কৌশলগুলির অন্যতম একটি (2)

বিঃ দ্রঃ—সূত্রের পরে প্রথম বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যাটি শব্দটির অক্ষরের সংখ্যা নির্দেশক।

মেচেদা, মেদিনীপুর-721137

অটোগ্রাফসহ গ্রন্থ উপহার

জুন সংখ্যার সিনিয়র ও জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্টের উপহার

অমরনাথ রায়ের

সংখ্যা নিয়ে খেলা

জুন সংখ্যার জুনিয়র ও সিনিয়র ফটো ক্যুইজের উপহার

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

মঙ্গল গ্রহে ঘনাদা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারীর

বঙ্গলক্ষ্মী

মাসিক লটারী

প্রথম পুরস্কার **৫ লাখ** টাকা

টিকিট ২্ টাকা

প্রতি মাসের ২য় শুক্রবার খেলা

দ্বিতীয় পুরস্কার (৫) প্রতিটি ৫০,০০০ টাকা
প্রতি সিরিজে একটি

তৃতীয় পুরস্কার (৬০) প্রতিটি ১০,০০০ টাকা
চুতর্থ পুরস্কার (৩০) প্রতিটি ১০০০ টাকা
পঞ্চম পুরস্কার (৩০০) প্রতিটি ৫০০ টাকা
ষষ্ঠ পুরস্কার (৩০০০) প্রতিটি ৫০ টাকা
সপ্তম পুরস্কার (৩০০০) প্রতিটি ২০ টাকা
অষ্টম পুরস্কার (৩০,০০০) প্রতিটি ১০ টাকা

এছাড়াও এজেন্ট ও বিক্রেতাদের জন্য আকর্ষণীয় কমিশন ও হাজার হাজার পুরস্কার (বোনাস)

বিশদ বিবরণের জন্য ▶ **অধিকর্তা, রাজ্য লটারী**
৬৯, গণেশচন্দ্র এ্যাভেন্যু কলিকাতা - ৭০০০১৩

নিজে নিজে কর

অটো স্টার্ট রেডিও

বাসুদেব সরকার

যে মডেলটার কথা বলছি সেটা খুবই সাধারণ মডেল। করাও সোজা। এটা করতে যে সব জিনিস লাগবে সেগুলি হলো—

1. একটি লিভার (চিত্র নং গ)
2. একটি পুশ অন সুইচ।
3. ট্র্যানজিস্টর রেডিওর একটি কর্ড তার সমেত।
4. তার
5. একটি কাঠের স্ট্যান্ড।

কিভাবে করতে হবে—

প্রথমে লিভারের বড় বাহুটি ঘড়ির অ্যালার্ম চাবির ওপর আর অন্যটির ঠিক নিচে রাখ পুশ অন সুইচ। এবার

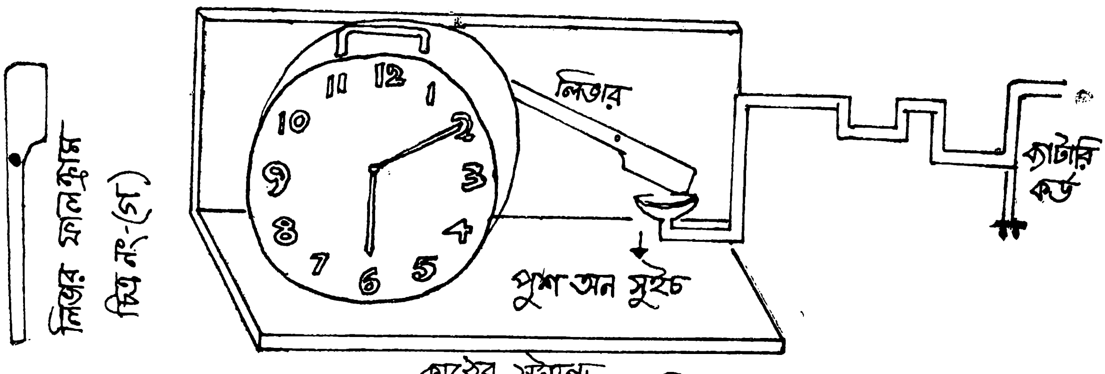

চিত্র নং (ক)

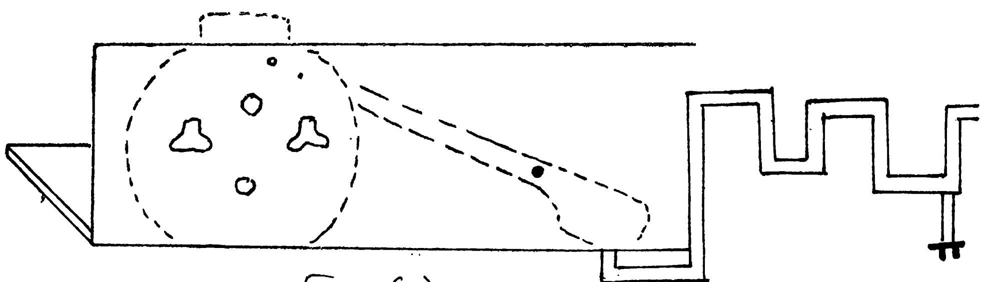

চিত্র নং (খ)

ট্র্যানজিস্টর রেডিওর ব্যাটারির কর্ডের তারকে কেটে পুশ অন সুইচের দুটি পোল থেকে আনা দুটো তারকে এনে কাটা তারের দু' মুখ ব্ল্যাক টেপ দিয়ে জুড়ে দাও। কাঠের স্ট্যান্ডটি দেখতে হবে—ঠিক চিত্র নং ক-এর মতো। লিভারের অবস্থান ঠিক চিত্র নং খ-এর মতো।

এবার অ্যালার্ম-ক্লকে দম দিয়ে রেডিওটা অন করে রেখে দাও। দেখবে ঠিক সময় মতো রেডিও চালু হয়ে যাবে।

মালদা, রাজা শরৎচন্দ্র রোড

সিনিয়র/জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট, আইকিউ টেস্ট, এবং ফটো ক্যুইজ এর উত্তরের সঙ্গে এই কুপনটি কেটে পাঠাতে হবে।

আমি..

বয়স.......................................শ্রেণী...............

বিদ্যালয়ের নাম...

আই কিউ টেস্ট/সিনিয়র/জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট ফোটো ক্যুইজ এর উত্তর পাঠালাম।

কিশোর রচনাবলী

জগদীশচন্দ্র বসু ॥ কিশোর রচনা সমগ্র ২৫্
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥
কিশোর রচনা সমগ্র ৩০্
প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥
শার্লক হোমস্ কিশোর সমগ্র ২৫্
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ॥ রোমাঞ্চকর ২৫
মেঘনাদ সাহা ॥ কিশোর রচনা সঙ্কলন ১২্

ভ্রমণ ও অভিযান

সুনির্মল বসু ॥ রোমাঞ্চের দেশে ৬্
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥
সুন্দরবনে সাত বৎসর ১০্
ধীরেন্দ্রলাল চক্রবর্তী ॥ দুরন্ত যাত্রী ৮্
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ॥ গঙ্গা যমুনা ৮্
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ॥
আমাজনের অরণ্যে ৮্
সুনির্মল রায় ॥ চাঁদের পাড়ি ৮্
দেবব্রত চক্রবর্তী ॥ চক্রতীর্থের চমক ১০

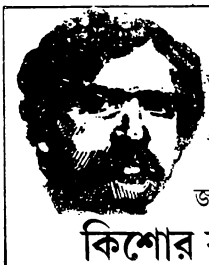

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর গল্প
প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী ও
চিঠিপত্রের মূল্যবান সঙ্কলন

জগদীশচন্দ্র বসু
কিশোর রচনা সমগ্র ২৫্

কিশোর ক্লাসিকস্

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ তেপান্তর ২০্
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ কিশোর অপু ২৫্
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
সন্দীপন পাঠশালা ১০্
তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ছোটদের কাজল ১০্
প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ ঘনাদা বিচিত্রা ২৫্
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
টেনিদার অভিযান ২৫্
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ বাঙলার ডাকাত ২৮্
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
অপুর ছেলেবেলা ১০্
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ছোটদের অপরাজিত ১০্

রহস্য রোমাঞ্চ ভৌতিক গল্প

হেমেন্দ্রকুমার রায় ॥ ভৌতিক গল্প ১০্
আনন্দ বাগচি ॥ মুখোশের মুখ ৮্
কোনান ডয়েল ॥ কিশোর রহস্য গল্প ১০্
কোনান ডয়েল ॥ কিশোর রোমাঞ্চ গল্প ১০্
কোনান ডয়েল ॥ কিশোর গোয়েন্দা গল্প ১০্
হেমেন্দ্রকুমার রায় ॥ মোহনপুরের শ্মশান ৬্
দেবব্রত চক্রবর্তী ॥ শেরিং হত্যা রহস্য ১০্
হেমেন্দ্রকুমার রায় ॥ যক্ষপতির রত্নপুরী ৬্
দীনেন্দ্রকুমার রায় ॥ যখের আসন ১০্

সম্প্রতি প্রকাশিত

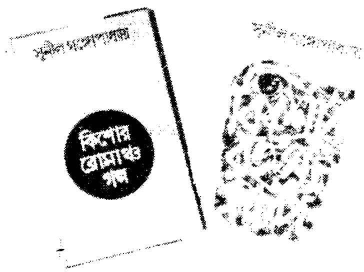

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
কিশোর রহস্য গল্প
কিশোর রোমাঞ্চ গল্প
প্রতিটি দশ টাকা

পশুপাখি বনজঙ্গলের গল্প

অমিতাভ চক্রবর্তী ছোটদের বাঘের গল্প ৮্
কেনেথ আন্ডারসন
শিবানীপল্লীর কালো চিতা ২০্
যোগীন্দ্রনাথ সরকার ॥ বনে জঙ্গলে ১৫্
অজয় হোম ॥ বিচিত্র জীবজন্তু ১২্
কেনেথ অআন্ডারসন
মানুষখেকোর বিভীষিকা ১৫্

বইমেলায় প্রকাশিত হবে

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ বাঙলার গাছপালা ১৫্
প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ মেজো কর্তার ভৌতিক গল্প ১৫্
খগেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ শেকসপীয়ারের গল্প ১০্
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ছোটদের মজার গল্প ১০্
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ সবার প্রিয় টেনিদা ১০্

R/No 37390/81 KISHORE JNAN-BIJNAN 6 th Yr Vol – 2. JUNE 1986/Regd.No. WBEC/255

ক্লাস অ্যানুয়ালে বেশী নম্বরের জন্য

অমরনাথ রায়	॥	সায়েন্স ক্যুইজ	১০.
অলক চক্রবর্তী	॥	ফিজিক্স ক্যুইজ	১০.
অমরনাথ রায়	॥	নলেজ ক্যুইজ	১০.
অরূপরতন ভট্টাচার্য	॥	গণিত ক্যুইজ	১০.
অমরনাথ রায়	॥	কেমিস্ট্রী ক্যুইজ	১০.

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ। ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত এবং ৮এ, দীনবন্ধু লেন, কলকাতা-৬, নিউ জয়কালী প্রেস থেকে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ ও রঙিন পাতা মুদ্রণে ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও প্রা:, লি: কলিকাতা

মূল্য- চার টাকা মাত্র